প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৬

প্রকাশক : ময়ূখ বসু বেঙ্গল
পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২ মুদ্রক : শিশির
কুমার সরকার শ্যামা প্রেস
২০বি ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭ প্রচ্ছদ : এম বিশ্বাস

দুই খুল্লতাত

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ চৌধুরী

শ্রীচরণেষু

নিবন্ধগুলি প্রধানত সাহিত্যবিষয়ক। তার মধ্যে প্রধান রবীন্দ্রনাথ। গত পনেরো বছর নানা পত্রিকায় নানা সময়ে ছাপা রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য সাহিত্য বা সাহিত্যিকবিষয়ক নিবন্ধ একসঙ্গে প্রকাশিত হল। প্রকাশের সব কৃতিত্ব শ্রীমান ময়ূখ বসুর।

এই লেখকের অন্যান্য বই :

গল্পের মত

অন্তনগর দর্শন

টুইস্ট

যবনিকা কম্পমান

অচেনা সহর কলকাতা

অন্যান্য

রবীন্দ্রনাথের পকেট বুক

সামান্য একখানা খসড়া খাতা, কিন্তু তার পাতায় পাতায় অসামান্য সব মণিমুক্তা। ছয় ইনচি লম্বা, তিন ইনচি চওড়া পুরু কালো মলাটের এই খাতার উপরে ইংরেজিতে লেখা—'আর এন টেগোর, পকেট বুক, ১৮৮৯।' অর্থাৎ মালিক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

কবির যৌবনের উল্লেখযোগ্য বহু বছরের সঙ্গী এই পকেট বুক বহু কবিতা, গান, ছবি, গদ্য রচনা, ডায়েরি ও হিসাবপত্রের জন্মভূমি। সোনার তরী থেকে উৎসর্গ—এর ব্যাপ্তিকাল। এই খাতা নিয়ে কবি ঘুরেছেন শিলাইদহে, পদ্মা আত্রাই বড়ল নাগর ইছামতীর বুকে, জোড়াসাঁকো শান্তিনিকেতন হাজারিবাগ আলমোড়া ওড়িশা মজঃফরপুরে। প্রায় পৌনে তিনশ পাতার খাতা। প্রতি পাতায় বিস্ময়, বেদনা ও সৃষ্টির যন্ত্রণা। ব্যক্তি ও স্রষ্টা—এই দুই রবীন্দ্রনাথ পেনসিল আর কালির আঁচড়ে পকেটবুকে মূর্ত হয়ে আছেন। রচনা শুরু হয়েছিল শিলাইদহে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা পরিবৃত এক সুখী সংসারের ছবি নিয়ে, আর খাতার পাতা যখন শেষ হল, তখন দেখতে পাই সেই সুখের সংসার ভেঙে পড়েছে—স্ত্রী মৃণালিনী দেবী পরলোকগত, কন্যা রেণুকা দুরারোগ্য রোগে অসুস্থ।

শ্রীযুক্ত কানাই সামন্ত এই পকেট বুকের নামাকরণ করেছেন 'মজুমদার-পুঁথি।' তার কারণ ওটি পাওয়া গিয়েছে রবীন্দ্রনাথের একদা-ঘনিষ্ঠ সুবোধচন্দ্র মজুমদারের পরিবার থেকে। ওঁদের কাছে পকেট বুক গেল কী করে? এই প্রসঙ্গে সুবোধবাবুর এক পুত্র সুনীল মজুমদারের বক্তব্য :—

'রবীন্দ্রনাথের লেখাটেখা বাবা গুছিয়ে রাখতেন শিলাইদহে। এই পকেটবুক কবির সর্বক্ষণের বন্ধু। ওটার ভিতরে গোঁজা থাকত

একটা পেনসিল। খুব 'পারসোনাল' ছিল বলে জমিদারির হিসেব থেকে শব্দতত্ত্ব—যা প্রয়োজন সবই ওটায় লিখে রাখতেন। জমিদারির হিসেব পেনসিলে চলবে না বলে লিখতেন খাগের কলমে আর সেরেস্তা কালিতে। অন্য রচনা লিখেছেন প্রথমে ওই পেনসিলে। তারপর 'ফেয়াব' করে নিতেন। সব যখন ভাল করে কপি করা হয়ে যায়, তখন ওটা বাবাকে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এটা তোমার কাছেই থাক সুবোধ। এত ভাল করে সব রাখতে পারো, এটা নিয়ে নাও তুমি।'

সুনীলবাবুর বক্তব্য সত্য হলে ধরে নিতে হবে জমিদারির হিসাবও রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতের লেখা। নয়ত লেখার ধরনে সন্দেহ হয়। ছাঁদ দেখে মনে হয়, অন্য কারও লেখা। আরও মজার ব্যাপার, ওই হিসাবের ফাঁকে ফাঁকেই তিনি সোনারতরী-র অনেক বিখ্যাতি কবিতা বিশেষ করে 'যেতে নাহি দিব' রচনা করেছেন।

সম্ভবত খাতাখানি প্রথমে আনা হয়েছিল জমিদারির হিসাব রাখার জন্যেই, পরে সাহিত্য রচনার তাগিদে সব হিসাব গরমিল হয়ে যায়। জমিদারির হিসাবে আছে বিরাহিমপুর, চরঘোষপুর, শাহজাদপুর, কালীগ্রাম ইত্যাদি পরগণার সদর খাজনার ও মুনাফার বিস্তৃত বিবরণ এবং সেরেস্তার ও ট্রাসটি দপ্তরের প্রধান প্রধান আমলাদের নাম ও বেতন। ওই খাতাতেই লেখা আছে দেওয়ান প্রসন্নকুমার বিশ্বাসের বেতন ছিল আড়াইশ টাকা, খাজানচি কাঙ্গালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ষাট টাকা এবং মুনসি কৈলাসচন্দ্র সিংহের পঞ্চাশ টাকা। তাছাড়া আরও কত টুকিটাকি হিসাব—কটকে 'বলুর জুতো ৬ টাকা ৪ আনা,' 'আমার জুতো ৫ টাকা ১২ আনা।' কবি গামছা কিনেছেন এক টাকা তিন আনা দিয়ে এবং চেনা কেউ পুরীর সমুদ্রে ডুবুডুবু হয়েছিল, তাই 'লোক উদ্ধারের জন্য বকশিস ৫ টাকা।'

আর আছে ওষুধ পথ্য ও কিছু আত্মীয়-বন্ধুদের নাম। গীত-রচনা যখন প্রবলবেগে ছুটছে, তখন হঠাৎ একটি পাতায় লিখেছেন—

পলতা	ছয়	আনা	করিয়া
অনন্তমূল	”	”	”
মনক্কা	”	”	”
আকনাদি	”	”	”
কটাকি	”	”	”

কুটিয়া আধসের জল দিয়া আগুনে বাড়াইয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ২/৩ ঘণ্টা অন্তত দুই তিন বারে দেড় ছটাক আন্দাজ খাওয়াইতে হইবে।

এটা কিসের ওষুধ কবি জানাননি। তারপরেই আবার একটি প্রণালী। লিখছেন—

'মাংস ৪ তোলা, কাঁচা মুগ চার তোলা আমলকি ১ তোলা—২ সের জল ১ সের তিন পোয়া থাকিতে হলুদ, ধনে, আদার রস, গোলমরিচ, লেবুর রস, লুন।'

তারপর আরও কিছু রচনার খসড়া এবং তারই ফাঁকে খাবারের লম্বা একটা তালিকা।—

'ডালসিদ্ধ, ছোলাসিদ্ধ, গমসিদ্ধ, যবের ছাতু, খইয়ের মোয়া, চিঁড়ে মুড়কি, চিঁড়ে ভাজা, মুগের নাড়ু, রাঙা আলু, আলুর নাড়ু, কলার সিন্নি, সরুচাকলি মুড়ি নারকেল, পান ফলের—, আদার বিসকুট, কচু, আটা ও গুড় (রুটি), আটা ও ডাল, খেসারি ও মসুরি ডালের—,

এই তালিকারই কাছাকাছি আত্মীয় ও বন্ধুদের নামের তালিকা। সবাই ঘনিষ্ঠ। সম্ভবত জ্যেষ্ঠাকন্যা মাধুরীলতার বিয়ের নিমন্ত্রণের জন্য তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন। নাকি বিডন স্কোয়ারের কংগ্রেসে দেশনেতাদের প্রস্তাবিত অভ্যর্থনাসভার নিমন্ত্রিত তালিকা? প্রথমেই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের উল্লেখ—

'বড়দাদা, দিপু, অরু, মোহিনী, যোগিনী, রমণী, নীতু, সুধী।

'মেজদাদা, সুরেন, বিবি।

'হিতু, আশু, অমি, ডি এন চাটার্জি (এই নামটি ইংরেজিতে লেখা), লক্ষ্মীজল, শোভনা।

'জ্যোতিদাদা।

'দাদা।

'বড়দিদি, সত্য, নিত্য ২।

'নদিদি, সরলা, হিরণ, জ্যোৎস্না।

'সেজদিদি, ছোটদিদি, সুকুমারী, অশ্বিনী, নলিনী বাড়ুজ্যে।

'গগন, জোতি, নীরু, শেষেন্দ্র, রজনী।

বন্ধুবান্ধদের নামের তালিকার শীর্ষে আছে ত্রিপুরা (বড়ঠাকুর) তারপর একে একে—সন্তোষ, কুচবিহার, (সুচারু), জগদীশ বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ত্রিবেদী, বি এল গুপ্ত, গণেন গুপ্ত, সি আর দাস (অমলা), মিসেস এস আর দাস, কে এন রায়, এল পালিত, শ্রীশ মজুমদার, প্রিয়নাথ সেন, শৈলেশ, আর সি দত্ত, গুরুদাস ব্যানার্জি, হীরেন দত্ত (সাহিত্য পরিষৎ), মৃণালিনী, পোয়েট ঘোষ ব্রাদার্স (ইংরেজিতে লেখা), গিরীন্দ্রমোহিনী, বরদাচরণ মিত্র, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, অক্ষয় বড়াল (প্রদীপ) বিজয় মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গগনচন্দ্র রায়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, চন্দ্রনাথ বসু, নবীনচন্দ্র সেন, অক্ষয় মৈত্র, লাহোরিনী, উমা দাস, প্রিয়, প্রবোধ, প্রভাতকুমার, অতুলচন্দ্র ঘোষ, শিবনাথ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেন্দ্র কুমার, রমনীমোহন ঘোষ, দীপেন্দ্রকুমার, রমনীমোহন ঘোষ, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রেমতোষ বসু (১১৫, আমহার্স্ট স্ট্রিট)। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন কবির কিছু কাব্যগ্রন্থের মুদ্রক। যেমন ক্ষণিকা।

তালিকার মধ্যে প্রথমে লিখে পরে নাম কাটার কয়েকটি দৃষ্টান্তও আছে। সম্ভবত ওইসব নামের চিঠি ডাকে ফেলা হয়ে গিয়েছিল যেমন—দিঘাপাতিয়া, ঘোষ অ্যানড কর, 'আমাদের উকীল' প্রেমতোষবাবু, পোয়েট হেমচন্দ্র (ইংরেজিতে লেখা)। হরিশচন্দ্র নিয়োগী, রাজনারায়ণ বসু, পূর্ণিয়ার রাজা। তারপরেই আবার নতুন করে

ইংরেজিতে লিখেছেন—'বাবু হেমচন্দ্র সেন, বাবু সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, কালীমোহন ঘোষাল, মহেন্দ্রচন্দ্র হোম, অভয়শংকর মজুমদার, অতুলানন্দ দত্ত, কুলদারঞ্জন রায়।

তালিকাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, সেযুগের সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা প্রায় সকলেই রয়েছেন এবং সর্বাগ্রে রয়েছে ত্রিপুরার বড়ঠাকুরের নাম, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজপরিবারের সৌহার্দ্যের আর একটি দৃষ্টান্ত।

খাতার অন্য প্রান্তে ২৬৮ সংখ্যক পৃষ্ঠায় অনেক কাটাকুটি তারই ফাঁকে আলাদা আলাদা লেখা Saturday August 4th 1889 বাবু রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী সরলা দেবী, কাশিয়া। উপরে লেখা 'memo, শ্রাবণ মাসের আরম্ভ হইতে ডাক্তার মৈত্রকে বার্ষিক ৭৫ টাকায় নিযুক্ত করা হইয়াছে। ৪ মাস অন্তর পঁচিশ করিয়া দেওয়া যাইবে।'

২৬৭নং পাতায় লেখা আছে কালো কালিতে 'শ্রীযুক্তবাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' তার পরেই 'আমার বক্ষ পরে মৃত্যু আসি নৃত্য করে গো, তার কেশ আলুলিত।' উপরে লেখা 'যা ছিল দিনু আজ, কী দিব কাল?' উলটো দিকে লেখা ১৪নং ডফ স্ট্রীট সুর এণ্ড কোং। প্রথম পাতাটিতে 'শুধু যাওয়া আসা' গানটি পুরো লিখে আগাগোড়া কেটে দিয়েছেন।

কবি হয়ত পরে কিছু লিখবেন। জমিদারী হিসাবের ফাঁকে কিছু বক্তব্য সংক্ষেপাকারে নোট করে খাতায় রেখেছেন। এই চলতি 'নোট' সম্ভবত নৌকায় করে পুরী যাওয়ার বা ছাড়ার পথে নেওয়া। খাতার পাতার গোড়ার দিকে "তালুক পাণ্ডুয়ার সদর খাজনার" হিসাব, তার পরেই—

'কাঠজুড়ি। ধূসর বালুকার প্রান্তে স্বচ্ছ স্রোত। উচ্চ পথ, দুই ধারে নিম্নক্ষেত্র। মুকুলিত আম্র বট অশ্বত্থ, খেজুর নারিকেল। বালুহন্তা ভার্গবী। সর্দাইপুর। পথে দূরে ভুবনেশ্বর। ধাউলি inscription। পাহাড়—উপরে ভগ্ন মন্দির। কেয়াগাছের বেড়া

মেঘদূত, নগনদী। সন্ধ্যার সময় বেড়ানো—দীর্ঘ পরিষ্কার ছায়াময় রাজপথ—দুই একটা covered carts। যাত্রীর অভাব। রাত্রে মুকুন্দপুর যাত্রা—নিদ্রাতুর। প্রাতে সত্যবাদী যাত্রা। পথে ক্রমে যাত্রীর অধিক্য। সারি ২ গাড়ি। সত্যবাদী। বলু-রা গেল। ভোগ উপহার। পুনর্বার যাত্রা। ক্রমে যাত্রীসংখ্যাবৃদ্ধি। সন্ন্যাসী পথের ধারে তরুতলে যাত্রীসমাগম। চটি। বড় ২ পুষ্করিণী। মন্দির। Swamps। পথতরুর বিরলতা। দক্ষিণে বৃহৎ বিলের মত, মধ্যে ২ চার ধান্য। পশ্চিমে তরুশ্রেণীর মধ্যে জগন্নাথ। বালুতীর। দুটি চারটি বিচ্ছিন্ন বাড়ি। সুনীল সঙ্গম। সন্ধ্যালোকে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ। খণ্ডগিরি। রানীগুম্ফ—ছবি—পালি লেখা—মানুষের ভাব খুদে রাখবার প্রবৃত্তি—উপর থেকে দৃশ্য—অরণ্য। মানুষটানা পাল্কি পথে দুই ধারে বিরলপত্র কুঁচলের বন। হাজারিবাগের ধরনে পাহাড়ে রাস্তা, সরীসৃপের মত। উপরে যখন চড়ে পর্বতদৃশ্য। দৈবাৎ মাঝে মাঝে ধানের ক্ষেত। বড় রাস্তা। দুই ধারে প্রস্তরময় উঁচুনীচু পাহাড়ে জমি। সম্মুখে ঘনমেঘ ও সুনীল পর্বতমালা। ঈষৎ বৃষ্টির সূত্রপাত। অদূরে বাঙ্গলা। মধ্যে ভাঙা পথ। বন্যায়।'
—তারপরেই অন্য প্রসঙ্গ।

কবি যখন সোনার তরী লিখছেন, তখন রচনার স্রোত অজস্রধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। প্রতীক্ষা কবিতাটির খসড়া শেষ হবার পর পাতার কোণে লিখেছেন, 'কলম ছুটেছে বেগে কালো অক্ষরের···' (পরের শব্দগুলো অস্পষ্ট)।

তারই তলায় প্রথমে লিখলেন—

কিছু নেই অবসর
সেই ঘড়ি ধরে উঠিয়াছি ভোরে
বন্ধ করেছি ঘর।
প্রভাতে প্রদোষে লিখিতেছি বসে
নিশীথে প্রদীপ জ্বালি।

অসম্পূর্ণ এই কবিতাটি একেবারে কেটে নস্যাৎ করে দিয়ে আবার লিখলেন—

নাহি অবসর।
আঁখি-ভরা ঘুমঘোরে
উঠিয়াছি কোন্ ভোরে,
বসিয়াছি ঘড়ি ধরে
রুধিয়াছি ঘর!
কলমের খোঁচা লেগে
ভাবগুলো রেগেমেগে
কাঁচাঘুমে উঠে জেগে
নাহি পায় পথ—

পরের সংশোধিত রূপটিও অসম্পূর্ণ এবং কবি তাও কেটে বরবাদ করে দিয়েছেন। সম্ভবত তখনকার মনের অবস্থা বোঝাবার জন্যেই উপরের ওই পঙ্ক্তিগুলো লেখা।

যে সব কবিতার প্রথম খসড়া ওই খাতায় রয়েছে, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যেতে নাহি দিব প্রতীক্ষা, পুরস্কার, বিম্ববতী, খাঁচার পাখি, বৈষ্ণব কবিতা গানভঙ্গ ইতাদি সোনার তরীর কবিতা এবং স্মরণ, চিত্রা ও উৎসর্গ কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতা। পাঠান্তরের জন্য সব কটি মূল্যবান। কয়েকটি কবিতা আবার অসমাপ্ত। তাছাড়া 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটির আদিরূপ কবির মনে কী ছিল, তার পরিচয়ও মেলে। 'যেতে নাহি দিব' কবিতা রচনার পরই কবি একটি পাতায় লেখেন—'হে সিন্ধু, ধরিত্রী তব গর্ভের সন্তান/অনিন্দ্য-সুন্দরী। কত দীর্ঘ যুগ ধরে/আঁধার জঠরে—।' সব কটি লাইনই কেটে দেওয়া।

কবিতা ছাড়া খাতায় আছে 'শব্দতত্ত্ব' পুস্তক রচনার প্রস্তুতি, বহু দেশী শব্দের সংকলন এবং 'সহজ পাঠের' প্রথম খসড়া। সহজ পাঠ প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালে, কিন্তু তার আদি ইতিহাস শুরু

১৩০২ সালে। সম্ভবত পুত্রকন্যাদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের তাগিদেই কবি তখন সহজ পাঠ রচনায় হাত দেন। এই খাতায় 'ছোট খোকা বলে অ আ, শেখেনি সে কথা কওয়া' নেই, আছে 'তুই বাবু অ আ, বসে খায় হাওয়া' 'তুই বিবি ই ঈ, শীতে কাঁপে হি হি' ইত্যাদি। আগাগোড়াই অন্যরকম। প্রসঙ্গত জানাই, ওই পকেট বুকেরই অন্য একটি পাতায় কচি হাতের (সম্ভবত পুত্র কন্যাদের কারও) লেখা—'তোমার কি, হি হি হি' আর সাধারণ পাটিগণিতের কিছু যোগবিয়োগ গুণ ভাগ।

মোট ৯০টি গানের খসড়া রয়েছে ওই পকেটবুকে। তার মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য হিন্দীভাঙা কয়েকটি গানের খসড়া। কখনও প্রথমে হিন্দী গানের কথা লিখেছেন, এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে বাংলা কথা বসিয়েছেন, আবার কখনও প্রথমে পুরো হিন্দী গানটা লিখে পরে তার বাংলা রূপান্তর করেছেন। যেমন 'শীতল তব পদছায়া, তাপহরণ তব সুধা' গানটির আগে কবি লিখেছেন—'বাঙ্গুরি মোরি মূর গৈঁয়ি জিন ছুঁয়ো × এ × লঙ্গরবা × রুর কিকলায়ী দোলন লাগে × নিডর ডরয়ে ঠানি ডারয়োবী সঙকীলুগয়ী সর, তুবামূর মুসাক গৈঁয়ী, সরকে ফরকে য়ে হা।

বাংলা গানটি লেখার পর লিখেছেন আর একটি হিন্দী গান—

কোনন বেলে এরী যহাঁ মোরা
পিয়া, হমারো, রলিলোঁ লোভয়া
য়াএ।
বারি হমারী উনাবিনা সজানী
রহী মুরুছা যায়ে।

তার পরেই লিখছেন—

বেহাগ

নিশিদিন জাগিয়া আছ নাথ হে
ঠাকুরিয়া অঁচরা মোরে ছাড়ি দে,

আজান ভয়িলে রাম কহো কর
নীম ধরম শো রাত করো।
এসি তোহে অনাপরী পানঘটা
বা গগরিয়া মোরে ছিন লায়ী, এসি
ছো তুরা ফকীর মোরা হিঁদিনিয়া
যাঁউরে।
আজি হৃদি আসনে তোমারে করি
প্যারি তোরে পাবানা পকারো, সব মেলি—
ইত্যাদি।

'তোমা বিনা কাটে দিবস হে প্রভু' গানটির শুরুতে লেখা আছে 'হাম্বির। বাগেশ্রী। ছায়ানট। কেদারা'। সংলগ্ন হিন্দী গানটি হচ্ছে 'তুম বিনা কৈসো রহগী পিয়ু।' 'হৃদয় আবরণ খুলে গেল' গানের হিন্দী হচ্ছে 'নয়ীরে মা ববন কোয়েলিয়া'। বাহার সুরের 'আজি মম মন চাহে জীবন'-~~এর~~ মূলে আছে 'অজহুঁ জপ ভবানীএ নব সমুঝ দেখ তূ ইয় জগম জীবন আবে মূঢ় ছনকো'। 'হরষে জাগো আজি জাগোরে তাহারি সাথে'র আগেই লেখা—'হরখ জাগো লাল, লাল লয় কেশারা রঙ্গা পীছেকারী।'

'আহা জাগি পোহালো' গানটিতে রাগ লেখা আছে 'রামকেলি'। পাশে 'মিশ্রতোড়ি' লিখে কাটা। আবার 'পুষ্পবনে পুষ্প নাহি' গানে প্রথমে 'রামকেলি' লিখে পরে 'কালাংড়া' লিখেছেন।

একটি পাতায় আছে অসমাপ্ত এবং পরে কেটে দেওয়া একটি গান—

'আমি তোমার পরশপাথরে
হয়েছি সোনা
সে কখনো ভুলিব না।
অকারণে মন মোহিল
কে প্রাণের মাঝে কি কহিল–

আর একটি পাতায় হিন্দীভাঙা 'শান্তি কর বরিষণ নীরব ধারে নাথ' গানটির উপরে লিখেছেন—'জয় ত্রিপুরনাথ/দয়াল বীরচন্দ্র/ গুণিজন প্রতিপালক/দাতা—।' অসম্পূর্ণ এবং কাটা। সম্ভবত মূল গানটি যদু ভট্টের লেখা।

ত্রিপুরাধিপতি বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুর নামাঙ্কিত আর একটি হিন্দী গানের বাংলা গানে রূপান্তর রয়েছে। হিন্দী গানটি কার রচনা? সেটিও কি যদুভট্টের? বোধ হয় তাই। যদুভট্ট রবীন্দ্রনাথের যেমন সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন, তেমনি ছিলেন ত্রিপুরা-রাজের সভা-গায়ক। (তিলককামোদ, চৌতালে যদুভট্টের লেখা একটি ধ্রুপদ গান, আছে—'তড়পত চিতমন তুম বিন হো' রাজাধিরাজ বীরচন্দ্র মানিক্য ত্রিপুরেশ্বর ঘরিপল ছিল' ইত্যাদি)। এই খাতায় আছে একটি গান 'শম্ভু শিব মহেশ আদি ত্রিলোচন' যার বাংলা রূপান্তর রবীন্দ্রনাথ করেছেন—ভক্তহৃদয় বিকাশ প্রাণবিমোহন।' মূল গানের শেষ দিকে আছে—বীরচন্দ্র নরপত প্রকাশ কর নাথ।' তার বাংলা রূপান্তর হল—প্রেমমূর্তি নিরুপম প্রকাশ কর নাথ হে।' আর একটি হিন্দী কালী কীর্ত্তন—'কালী নাম চিন্তন করোরে মন' গানকে একেবারে ব্রহ্মসংগীতে রূপান্তর করে কবি লিখেছেন 'নিত্য সত্যে চিন্তন করোরে বিমল হৃদয়ে।'

প্রায় সব কয়টি গানেই প্রচুর কাটাকুটি, প্রচুর পরিবর্তন। তার মধ্যে 'গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে' গানটি রচনার ইতিহাস উল্লেখ করার মত। বন্ধনীর মধ্যে গোড়ায় লেখা কাটা শব্দটি দেওয়া হল। কবি প্রথমে লেখেন—

অসীম মঙ্গলে মিলিল মাধুরী
খেলা হল সমাধান
চপল চঞ্চল লহরীলীলা
অতলে হল (নিমগন) অবসান
হৃদয়গ্রন্থি মধুর মন্ত্রে হৃদয় মাঝে

সব আকাঙ্ক্ষা হইল মোচন
শান্তি শান্তি শান্তি বাজে
স্তব্ধ হল আজি সকল শোচন
(শান্ত শোভা নিরখি অন্তরে)
অরূপকান্তি নিরখি অন্তরে
মুদিত লোচনে চাই
এ কি শোভা অতুলন।

উপরের ওই অংশ পুরো কেটে দেওয়া এবং তারই নীচে যে-অংশটুকু লেখা, তাকে প্রথম অংশের উপরে লাইন টেনে তুলে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং একই পাতায় নীচের অংশে আছে—

মধুর সন্ধ্যা নামিল হৃদয়ে
আর কোলাহল নাই
(সকল বাসনা) রহি ২ শুধু সুদূর (হতে) সিন্ধুর
(ফিরিয়া এল এক ঠাঁই)
ধ্বনি শুনিবারে পাই
সব আকাঙ্ক্ষা চিত্তে আসে ফিরে
(লুপ্ত হল দিশা স্নিগ্ধ তিমিরে)
গভীর আঁধার ঘনায় বাহিরে
(নিভৃত অন্তরে জ্বলিল দীপশিখা)
একটি দীপ শুধু হেররে অন্তরে
(তাই দেখে ঘরে যাই)
নিভৃতে জ্বলে এক ঠাঁই।

গীতরচনা শেষ হওয়ার পরই উপর থেকে নীচে দাগ টেনে দুই অংশ আবার আলাদাভাবে কেটে দেওয়া এবং তার পরের পাতায় দ্বিতীয় খসড়ায় নতুন করে লিখলেন—

মধুর সন্ধ্যা নামিল হৃদয়ে। 'মধুর সন্ধ্যা' কেটে করলেন 'নিশীথ রজনী'; 'নিশীথ' কেটে করলেন 'গভীর' এবং তার পরে দাঁড়াল—

গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে
আর কোলাহল নাই
রহি রহি শুধু সুদূর সিন্ধুর
ধ্বনি শুনিবারে পাই।
সকল (আকাঙ্ক্ষা) বাসনা
চিত্তে (আসে) এল ফিরে
নিবিড় আঁধার ঘনাল বাহিরে
(একটি) প্রদীপ একটি (শুধু হেররে)
নিভৃত অন্তরে
(নিভৃতে জ্বলে) জ্বলিতেছে এক ঠাঁই।
অসীম মঙ্গলে মিলিল মাধুরী
খেলা হল সমাধান
চপল চঞ্চল লহরীলীলা
(অতলে হল) পারাবারে অবসান।
(গভীর) নীরব মন্ত্রে (চিত্ত) হৃদয়মাঝে
শান্তি শান্তি শান্তি বাজে !
অরূপকান্তি নিরখি অন্তরে
মুদিত লোচনে চাই।

এই পাঠই বহাল পরবর্তী রচনাবলীতে।

গান কবিতা হিসাবপত্র সব বাদ দিলেও এই পকেটবুকটি স্মরণীয় হয়ে আছে অন্য একটি কারণে। আমাদের প্রচলিত ধারণা, রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকায় মন দেন শেষ বয়সে, সত্তরের কাছাকাছি এসে। এবং আর একটি ধারণা, রচনার কাটাকুটিই তাঁর চিত্রশিল্পের উৎস।

দুই ধারণাই পুরোপুরি ঠিক নয়। তার প্রমাণ এই পকেটবুক। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কবির বয়স আঠাশ। সেই সময় থেকেই যে তিনি ছবি আঁকায় উৎসাহী একজন দক্ষ শিল্পী, তার পরিচয় এই পকেট-

বুকের পাতায় পাতায়। কবিতা বা গানের কাটাকুটি থেকে কিছু চিত্রের ছাঁদ তৈরি হয়েছে বটে তবে বেশির ভাগ ছবিই পৃথক এবং নিপুণ হস্তের পরিচয়বাহী।

পকেটবুকের শুরুতেই তিন নমবর পৃষ্ঠায় পুরো পাতা জুড়ে ছুটো পাখির ছবি—পাকা হাতের কাজ। পেনসিলে আঁকা ঠোঁট, দেহের গড়ন সবই চমৎকার, কে বলবে আনাড়ি। তার আগের পৃষ্ঠায় হিজি-বিজি নানা জিনিস লেখা এবং কয়েকটি মুখের প্রোফাইল—ছুটি স্পষ্ট, অন্যগুলি ঝাপসা বদনযুগল যত ক্ষুদ্র হোক, কলমের টানে জড়তা নেই। প্রথম পৃষ্ঠাতেও আর একটি মুখ—প্রোফাইল নয় মুখোমুখি। পাশে আর একটি অসম্পূর্ণ চিত্র উলটো করে ধরলে বোঝা যায় একটি ফুল আঁকার চেষ্টা।

ভিতরে ব্যক্তিগত হিসাবের টুকিটাকির উপরে অসাধারণ এক নারীমূর্তি—ছন্দোময়ী কৃষ্ণাঙ্গী। রবীন্দ্রচিত্রকলার গবেষকদের কাছে এই ছবি অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ এই ছবির সঙ্গে তাঁর বৃদ্ধ বয়সে আঁকা ছবির দারুণ মিল।

অনেক সময় লেখার ফাঁকে ফাঁকে ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলেছে, ফুলের আদল, ফুল, পাপড়ির বিস্তার সব কিছু এবং তার উপরে লাইন টানতে টানতে দাঁড়াল তোরণের আকারে আর একটি চিত্র। আবার বহু লেখার ফাঁকে বিশেষ করে প্রথম পঙক্তি শুরুর সময় করে অনেক আঁকিবাঁকি করেছেন এবং তা করতে করতেও নানা রকম ছবির আদল এসে গিয়েছে। রচনার মধ্যে কাটাকুটি করতে গিয়ে পেনসিলের আঁচড় কখনও পুষ্পালঙ্কার, কখনও নকশা। আর লেখা কাটতে কাটতে কত কিছু যে ধরা পড়েছে, তার শেষ নেই।

শেষ নেই আরও অসংখ্য তথ্যের। পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে হলে পুরো পকেট বুকটাই কপি করে দিতে হয়। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসুরা পরে এই নিয়ে অনেক থিসিস লিখতে পারবেন, তাঁদের জন্যে বাকিটা তোলা রইল।

আপন মানুষের দূতী

বাংলা দেশের বাইরে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রথম অনুরাগিণী আন্না তড়খড়। আন্নার স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের কাছে চিরদিন অম্লান ছিল। তিনি তাকে বলেছেন—'আপন-মানুষের দূতী।' বলেছেন, এই আন্নাই তাঁর 'হৃদয়ের দখলের সীমানা বড় করে দিয়ে' গেছেন।

তরুণ কবির রূপমুগ্ধ 'ঝকঝকে মেয়ে আন্নার জীবন সম্পর্কে বিশদ কিছু এতদিন জানা যায়নি। রবীন্দ্রনাথ নিজে আন্না সম্পর্কে সামান্য কিছু লিখেছেন এবং এখানে সেখানে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অসংলগ্ন তথ্য কিছু ছড়িয়ে আছে।

১৮৭৮ সনে, রবীন্দ্রনাথের বয়স সতেরো। সেই সময় প্রথম বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে তিনি যান আমেদাবাদে। মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থলে। কয়েক মাস আমেদাবাদে রেখে সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেন বোম্বাই। তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে। উদ্দেশ্য, লাজুক রবিকে সাহেবিয়ানায় তালিম দেওয়া।

সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গ তড়খড়ের পরিবার ইংরেজী শিক্ষা এবং ইংরেজিয়ানার জন্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পাণ্ডুরঙ্গের কন্যা আন্না বিলাত ফেরতা। ইংরেজী ভাষায় আর আদবকায়দায় তাঁর অসাধারণ দখল। এই অসামান্য সুন্দরীর কাছেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম পাঠ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় বান্ধবীকে 'কবি-কাহিনী' কাব্যখানা শুনিয়ে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন।

বই আকারে যখন এই কাব্য ছাপা হয়, রবীন্দ্রনাথ তখন বম্বেতে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে) কলকাতা থেকে আন্নাকে একখণ্ড 'কবি-কাহিনী' পাঠিয়ে দেন।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র-জীবনী প্রথম খণ্ডে' বলেছেন —'এই তরুণী কবিকে যে ভালবাসিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই।' দিলীপকুমার রায়ের লেখা 'তীর্থংকরে' কবির সঙ্গে আন্নার অন্তরঙ্গতার কয়েকটি সুন্দর ছবি আছে। 'ছেলেবেলা' বইয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন—

—'এখানে কিছুদিন থাকার পর মেজদাদা মনে করলেন, বিদেশকে যারা দেশের রস দিতে পারে সেই রকম মেয়েদের সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দিতে পারলে হয়তো ঘরছাড়া-মন আরাম পাবে। ইংরেজি ভাষা শেখবারও সেই হবে সহজ উপায়। তাই কিছুদিনের জন্যে বোম্বাইয়ের কোন গৃহস্থঘরে আমি বাসা নিয়েছিলুম। সেই বাড়ির কোনো একটি এখনকার কালের পড়াশুনোওয়ালা মেয়ে ঝকঝকে করে মেজে এনেছিলেন তাঁর শিক্ষা বিলাত থেকে। আমার বিদ্যে সামান্যই, আমাকে হেলা করলে দোষ দেওয়া যেতে পারত না। তা' করেন নি। পুঁথিগত বিদ্যা ফলাবার মত পুঁজি ছিল না, তাই সুবিধে পেলেই জানিয়ে দিতুম যে কবিতা লেখবার হাত আমার আছে। আদর আদায় করার ঐ ছিল আমার মূলধন। যাঁর কাছে নিজের কবিআনার জানান দিয়েছিলেম, তিনি সেটাকে মেপেজুখে নেননি, মেনে নিয়েছিলেন।'

তরুণ কবির সঙ্গে আন্নার সম্পর্ক ছিল অতি মধুর। আন্না কারণে অকারণে তাঁকে সঙ্গ দিতেন। রবীন্দ্রনাথ হয়ত একা ঘরে বসে আছেন কিংবা টেবিলের উপর ঝুঁকে কিছু লিখছেন, হঠাৎ চুপি চুপি, ঢুকে পড়লেন আন্না। পেছন থেকে দু'হাত দিয়ে কবির চোখ জড়িয়ে ধরলেন।—'বল তো কে?' চাঁপাকলি আঙুলের তুলতুলে স্পর্শে রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন, কার এই চাতুরী। আন্না খিলখিল হেসে ওঠেন।

রবীন্দ্রনাথ আন্দাজ করেন, আন্নার মনে একটা কিছু ঘটেছে। সেটকা বোঝার বয়স তাঁর হয়েছে। কিন্তু কি হবে, তাঁর তরফ থেকে

কোন উৎসাহ বা তাগিদ নেই।

একদিন এক পূর্ণিমা সন্ধ্যায় আন্না কবির অজ্ঞাতসারে হাতে দস্তানা নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েন। সেদিন আকাশে মাদকতা, বাতাসে মাদকতা। রূপসী আন্না কবির পাশে বসে পড়লেন। খানিকবাদে ঘুমের ভাণও ধরলেন। কবির সব তালগোল পাকিয়ে যায়। কি বলবেন, কি করবেন ভেবে পান না।

আগের দিন আন্না ঘুমের মধ্যে মেয়েদের দস্তানা-চুরির গূঢ়ার্থ নিয়ে কবিকে এক রসিকতা করেছিলেন। বলেছিলেন, চুরি করতে পারলে মেয়েটিকে চুম্বনের অধিকার জন্মায়। এই রসিকতা ও সে সময়কার অনেক ঘটনা রবীন্দ্রনাথ নাকি নিজেই শেষ বয়সে দিলীপকুমার রায়কে কথাচ্ছলে বলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ দিলীপ রায়কে আরও বলেছিলেন—'সে মেয়েটিকে ভুলিনি বা তার সে-আকর্ষণকে কোনো লঘু লেবেল মেরে খাটো করে দেখিনি কোনোদিন। আমার জীবনে তারপর নানান অভিজ্ঞতার আলোছায়া খেলে গেছে—'বিধাতা ঘটিয়েছেন কত যে অঘটন—কিন্তু আমি একটা কথা বলতে পারি গৌরব করে যে, কোনো মেয়ের ভালবাসাকে আমি কখনও ভুলেও অবজ্ঞার চোখে দেখিনি—তা সে ভালোবাসা যে-রকমই হোক না কেন।'

এই তরুণীর সঙ্গে প্রীতির সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে 'ছেলেবেলা' বইয়েও রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন—'জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড় করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয়, বরাবরের মতো দিন রাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে।'

এই আন্নাই সর্বপ্রথম কবির রূপের প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর মুখেই প্রথম তিনি শুনেছিলেন চেহারার তারিফ। আর রবীন্দ্রনাথের

লেখা গান রবীন্দ্রনাথেরই মধুর কণ্ঠে শুনে আন্না বলেছিলেন—'কবি, তোমার গান শুনলে আমি বোধহয় আমার মরণ দিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।'

আন্না রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন, 'তুমি কোনো দিন দাড়ি রেখো না—তোমার মুখের সীমানা যেন ঢাকা না পড়ে।'

রবীন্দ্রনাথ সে অনুরোধ পরবর্তী জীবনে রাখতে পারেন নি। তিনি নিজেই এক জায়গায় বলেছেন—'আমার মুখে অবাধ্যতা প্রকাশ পাবার পূর্বেই তার মৃত্যু হয়েছিল।'

আন্নার জীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রানুরাগী মহলে কৌতূহলের অন্ত নেই। সম্প্রতি মারাঠি মাসিক পত্রিকা 'মনোহর'-এর সেপ্টেম্বর, ১৯৬১ সংখ্যায় শ্রী এস. বি. যোশী আন্নার জীবন সম্বন্ধে কিছু নতুন তথ্য পরিবেশন করেছেন একটি প্রবন্ধে।

এতদিন জানা ছিল আন্না রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তিন বছরের বড় ছিলেন। অর্থাৎ প্রথম পরিচয়ের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স সতেরো, আন্নার বয়স কুড়ি। শ্রী যোশীর মতে আন্নার জন্ম ১৮৫৫ সনে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের চাইতে ছয় বছরের বড়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের পরের বছর ১৮৭৯ সনের ১৮ই নভেম্বর বম্বেতে ৩৫ বৎসর বয়স্ক মিস্টার হ্যারল্ড লিট্‌লডেল নামক এক স্কচ শিক্ষাবিদের সঙ্গে আন্নার বিয়ে হয়। মিস্টার লিট্‌লডেল বরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষ ছিলেন। বিয়ের পর ১৮৮০ সনে আন্না ওরবোদার রানীর গৃহশিক্ষিকা রূপে কাজে যোগ দেন।

বরোদাতে কিছুকাল থাকার পর লিট্‌লডেল-দম্পতি এডিনবরা চলে যান। ভারত ত্যাগের পর মাতৃভূমির সঙ্গে বা নিজের পরিবারের সঙ্গে আন্নার বিশেষ কোন যোগাযোগ ছিল না বলেই মনে হয়। আন্নার দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

আন্নার মৃত্যুকাল সম্বন্ধে সঠিক কোন তারিখ বা অন্যান্য বিবরণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এতদিন জানা ছিল, তাঁর সমাধি

বম্বের কাছাকাছি এক কবরস্থানে রয়েছে। এখন শোনা যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে এডিনবরাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

আর একটি মত অনুযায়ী আন্নার বিয়ে হয়েছিল ইংলণ্ডে তিনি বিবাহবিচ্ছেদের পর দেশে ফিরে আসেন এবং সেখানেই ক্ষয় রোগের আক্রমণে মারা যান।

কিন্তু বোম্বেতে ম্যারেজ-রেজিস্টারের অফিসে আন্না ও মিস্টার লিট্‌লডেলের বিয়ের এক রেকর্ড পাওয়া গেছে। সমসাময়িক পত্রিকাতেও এই বিয়ের উল্লেখ আছে। ঐ বিবরণ থেকে আরও জানা যায়, বিয়ের পর তড়খড়ে পরিবারের সকলে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিমন্ত্রণে তাঁর গৃহে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

আন্নার কোন ফটো এতদিন পাওয়া যায়নি। বোম্বাইপ্রবাসী শ্রীসলিল ঘোষ অনেক কষ্টে আন্নার এক দুষ্প্রাপ্য ফটো ও বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করে রবীন্দ্রানুরাগীদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। এই ফটো আন্না ও লিট্‌লডেলের বিয়ের পর তোলা।

মুদ্রিত ছবি ছাড়া আন্নার আর একখানি মাত্র ছবি পাওয়া যায়। বম্বের আলেকজান্দ্রা স্কুলে ছাত্রীরূপে অন্যান্য বালিকার সঙ্গে আন্না ঐ ছবিতে আছেন।

প্রথম পরিচয়ের পর আন্নার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আর দেখা হয়নি কিন্তু তিনি তাঁর প্রথম যুগের কাব্যে আন্নাকে অমর করে রেখে গেছেন।

কবির কাছে আন্না একটি ডাক নাম চান। কবি নাম দেন 'নলিনী।' এই নামটি রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়। 'কবিকাহিনীর' নায়িকা নলিনী, ভগ্নহৃদয়ের নায়িকা নলিনী এবং নলিনী নামে আলাদা একটি ছোট নাটকই আছে। ভগ্নহৃদয়ে 'নলিনী'র পরিচয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—এক চপল স্বভাবা কুমারী। ভগ্নহৃদয়ে কবি এক জায়গায় বলছেন—

শুনেছি শুনেছি তাহা,
নলিনী নলিনী নলিনী নলিনী
কেমন মধুর আহা।

এই সকল কবিতা আন্নার সঙ্গে পরিচয়ের পর লেখা। তাছাড়া 'ছেলেবেলায়' লেখা আছে—(আন্না কবির কাছ থেকে একটা ডাকনাম চাইলেন), 'দিলেম জুগিয়ে, সেটা ভালো লাগল তাঁর কানে। ইচ্ছে করেছিলেম সেই নামটি আমার কবিতার ছন্দে জড়িয়ে দিতে। বেঁধে দিলুম সেটাকে কাব্যের গাঁথুনিতে', শুনলেন সেটা ভৈরবীর সুরে।

আন্নার উদ্দেশ্যে রচিত এই গান 'শৈশব সংগীতের' অন্তর্ভুক্ত। গানটির প্রথম চার পংক্তি হচ্ছে এই—

শুন নলিনী খোলো গো আঁখি
ঘুম এখনো ভাঙিলো না কি।
দেখো তোমারি দুয়ার-পরে
সখী এসেছে তোমারি রবি।

নলিনী-আন্না সম্পর্কে আরও কিছু কবিতা অপ্রকাশিত আছে। শান্তিনিকেতনের 'রবীন্দ্র সদনে' রক্ষিত মালতী-পুঁথিতে আন্না সম্পর্কিত দুটি কবিতা পাওয়া যায়। নলিনী নামটি কবির প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।

আর একটি জিনিস লক্ষ্যণীয়। রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণীর নাম ছিল ভবতারিণী। বিয়ের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম দেন মৃণালিনী। নলিনী এবং মৃণালিনী শব্দ দুটি সমার্থক।

উৎসর্গ পৃষ্ঠা

গ্রন্থরচনার সমাপ্তিতে উৎসর্গ-পৃষ্ঠা পূর্ণ করার কাজ ছোটবড় অনেক লেখককেই ভাবনায় ফেলে। আত্মীয়ের বন্ধু-বান্ধবের প্রিয়জনের পরিচিত নামগুলি কলমের মুখে এসে ভিড় জমায়। তার ভিতর থেকে বাছাই করে একটি কি দুটি নাম উজ্জ্বল করে রাখতে হয় নতুন লেখা বইয়ের উৎসর্গ-পৃষ্ঠায়!

বহু গ্রন্থের স্রষ্টারা এই ব্যাপারে সৌভাগ্যবান। তাঁরা বহু প্রিয়জনকেই বই উৎসর্গ করে খুশী রাখতে পারেন। এই শ্রেণীর সৌভাগ্যবানদের তালিকায় রবীন্দ্রনাথের স্থান পয়লা নম্বরে আসবে। প্রায় তিনশত মত গ্রন্থের স্রষ্টা বই উৎসর্গের মারফৎ বহু প্রিয়জনকে শ্রদ্ধা, প্রীতি বা স্নেহ বিতরণের সুযোগ পেয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় তিনি কিন্তু সে সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেননি। হিসেব করে দেখা গেছে তিনি মাত্র চৌষট্টিখানা বই বিভিন্ন লোককে উৎসর্গ করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা বইয়ের উৎসর্গ পৃষ্ঠায় স্থান পেয়ে যাঁরা সৌভাগ্যবান ও অন্যের ঈর্ষার পাত্র, তাঁদের নামের একটি তালিকা কৌতূহলী পাঠকের কাছে তুলে দেওয়া যেতে পারে। এবং বই উৎসর্গ করার ব্যাপারে সামাজিক ও পারিবারিক রবীন্দ্রনাথের মনের একটা মোটামুটি পরিচয় এর থেকে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের লেখা বই দু'খানার বেশী কেউ পাননি, যাঁরা দু'খানা করে পেয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা সাত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পেয়েছেন 'আলোচনা' ও 'নৈবেদ্য', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর পেয়েছেন 'রুদ্রচণ্ড' ও 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', লোকেন পালিত পেয়েছেন 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি' ও 'ক্ষণিকা', জগদীশচন্দ্র বসু পেয়েছেন 'কথা' ও 'খেয়া', সুরেন্দ্রনাথ কর পেয়েছেন 'রাশিয়ার চিঠি' ও 'আরোগ্য', রাজশেখর

বসু পেয়েছেন 'পরিশোধ' আর 'সুর ও সঙ্গীত'। শেষোক্ত বইখানা ধূর্জটি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ।

রবীন্দ্র-গ্রন্থের উৎসর্গ-পৃষ্ঠার চির উজ্জ্বল অন্যান্য সৌভাগ্যবানদের নামের তালিকা নীচে দেওয়া গেল ;—

সৌদামিনী দেবী (বৌঠাকুরাণীর হাট), ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী (প্রভাত সঙ্গীত), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (কড়ি ও কোমল), জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (সমালোচনা), সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিসর্জন), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রাজা ও রাণী), প্রিয়নাথ সেন (গোড়ায় গলদ), দেবেন্দ্রনাথ সেন (সোনার তরী), বিহারীলাল গুপ্ত (ছোটগল্প), আশুতোষ চৌধুরী (গল্প দশক), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (নদী), জগদিন্দ্রনাথ রায় (পঞ্চভূত), প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (কণিকা), রাধাকিশোর দেববর্মন (কাহিনী), শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (কল্পনা) বিধুশেখর শাস্ত্রী (বাংলা শব্দতত্ত্ব), রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গোরা), যদুনাথ সরকার (অচলায়তন), সি, এফ, এণ্ডরুজ (উৎসর্গ), দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ফাল্গুনী) প্রমথ চৌধুরী (ঘরে বাইরে) ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (সঞ্চয়), উইলিয়ম পিয়ার্সন (বলাকা), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (জাপানে পারস্যে), কাজী নজরুল ইসলাম (বসন্ত), বিজয়া দেবী অর্থাৎ ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো (পূরবী), লেডি রাণু মুখার্জী (ভানুসিংহের পদাবলী), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কালের যাত্রা), নীতিন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (পুনশ্চ), নন্দলাল বসু (বিচিত্রিতা), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (চিত্রাঙ্গদা), সুভাষচন্দ্র বসু (তাসের দেশ), দিলীপকুমার রায় (ছন্দ), কৃষ্ণ কৃপালনী ও নন্দিতা কৃপালনী (পত্রপুট), রাণী মহালনবীশ (শ্যামলী), অমিয় চক্রবর্তী (সাহিত্যের পথে), প্রতিমা দেবী (ছড়ার ছবি), চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (সে), অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু (বিশ্বপরিচয়), নীলরতন সরকার (সেঁজুতি), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (বাংলা ভাষা পরিচয়), কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (আকাশ-প্রদীপ) নন্দিতা কৃপালিনী (গল্পসল্প)।

স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর নাম করে রবীন্দ্রনাথ কোন বই উৎসর্গ করেননি, তবে 'স্মরণ' স্ত্রীর মৃত্যুর পরে লেখা এবং পুরো বইটাই স্ত্রীর নামে উৎসর্গ করা। উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় শুধু লেখা আছে স্ত্রীর মৃত্যু তারিখ '৭ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯'। 'পত্রপুট' দৌহিত্রী নন্দিতা কৃপালনীর এবং 'নদী' বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ-পরিণয় উপলক্ষে উৎসর্গ করা।

রথীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোন পুত্র-কন্যার নামে রবীন্দ্রনাথ কোন বই উৎসর্গ করেননি। তবে 'শিশু' 'মাতৃহীন পুত্রকন্যাদের পরিতোষের জন্য'।

তাছাড়া আরও ছ'খানা বই আছে, যার উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে কারও নাম লেখা নেই, আছে ইঙ্গিতে।

সেই ছ'খানা বই রবীন্দ্রনাথের একেবারে প্রথম দিকের লেখা 'ভগ্ন হৃদয়', 'শৈশব সঙ্গীত', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' 'ছবি ও গান' এবং 'মানসী'।

উৎসর্গ পত্রের বক্তব্য দেখে মনে হয়, ঐ ছ'খানা বই-ই 'কোন একজন স্নেহশীলা নারী'র স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা। রবীন্দ্র সাহিত্য ও জীবন সম্পর্কে উৎসাহী পাঠকের কাছে সে নাম খুঁজে বের করা কঠিন ব্যাপার নয়। কিশোর কবির তৎকালীন মানসিক অবস্থার কিছু পরিচয়ও ঐ ছ'খানা বইয়ের উৎসর্গ-পৃষ্ঠার ভাষায় ও বক্তব্যে পাওয়া যায়।

'ভগ্ন-হৃদয়' উৎসর্গ পৃষ্ঠায় লেখা আছে···'শ্রীমতী হে······' তারপরই ত্রিশ পঙক্তির দীর্ঘ কবিতা। তার প্রথম দুটি পঙক্তি—

'হৃদয়ের বনে বসে সূর্যমুখী শত শত,
ঐ মুখপানে চেয়ে ফুটিয়া উঠিছে যত।'

'ভারতী' পত্রিকায় ঐ বইখানা প্রকাশের সময় উপহার-কবিতা ছিল 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' গানটি। 'শৈশব সংগীত' বইয়ের উপহারে লিখেছেন—'এ কবিতাগুলিও তোমাকে দিলাম। বহুকাল হইল, তোমার কাছে বসিয়া লিখিতাম, তোমাকেই

শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাই মনে হইতেছে, তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ-লেখাগুলি তোমার চোখে পড়িবেই।

'ছবি ও গানে'র উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় লেখা আছে—'গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসরকার বসন্তের মালা গাঁথিলাম। যাহার নয়ন-কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত, তাহারি চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম।'

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে লিখেছেন,—'ভানুসিংহের কবিতাগুলি ছাপাইতে তুমি আমাকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলে। তখন সে অনুরোধ পালন করি নাই। আজ ছাপাইয়াছি, আজ তুমি আর দেখিতে পাইলে না।'

ঐ যুগেরই লেখা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' বইয়ের উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় শুধু লেখা আছে---'তোমাকে দিলাম।'

উপরে দেওয়া নামের তালিকা থেকে দেখা যাবে অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মা সারদাদেবী কোন বই পাননি। শৈশবে মাতৃস্নেহ পরিপূর্ণভাবে ভোগ না করার :বেদনা কি গ্রন্থোৎসর্গের ক্ষেত্রেও ফুটে উঠেছে? পিতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আবাল্য অন্তরঙ্গতা সর্বজনবিদিত। তাই দেখি তাঁর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে দু'খানা বই। বহু সহোদরের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিল তাঁর মনের মিল বেশী। তাই ঐ তিনজনই উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছেন। তাদের মধ্যে আবার জ্যোতিদাদা ছিলেন বেশী অন্তরঙ্গ, তিনি পেয়েছেন দু'খানা বই! ভগ্নীদের মধ্যে পেয়েছেন একমাত্র সৌদামিনী দেবী—শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী শ্রীচরণেষু।'

সত্যেন্দ্রনাথের পুত্রকন্যা ইন্দিরা দেবী ও সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিল খুল্লতাত রবীন্দ্রনাথের আবাল্য প্রীতি। এঁরা দুজনেই পেয়েছেন একখানা করে বই। প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রাথ ও বলেন্দ্রনাথও

পেয়েছেন একখানা করে বই। সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীও একখানা।

পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রতুল্য জামাতা প্রমথ চৌধুরী দুজনেই পেয়েছেন দু'খানা বিখ্যাত উপন্যাস 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে'। এই দুই বইয়ের উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় উৎসর্গ-রীতি হুবহু এক 'শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কল্যাণীয়েষু এবং শ্রীমান প্রমথনাথ চৌধুরী কল্যাণীয়েষু।'

অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে পেয়েছেন পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, পৌত্র দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মীরা দেবীর পুত্র নীতিন্দ্রনাথ—যিনি অকালে বিদেশে মারা যান (পুনশ্চ ··'নীতু')। আর পেয়েছেন 'নীতু'র ভগ্নী নন্দিতা কৃপালনী।

বিদেশীদের মধ্যে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ ভক্ত পিয়ার্সন ও এণ্ডরুজ। আর ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো—যে নারী 'মাধুর্যসুধায়' পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ-আমেরিকা 'প্রবাসের দিন।'

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে জগদীশ বসু, লোকেন পালিত, ব্রজেন শীল, প্রিয়নাথ সেন, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জগদিন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি সকলেই পেয়েছেন একখানা দু'খানা করে বই।

রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে পেয়েছেন একমাত্র সুভাষচন্দ্র বসু এবং রবীন্দ্র পরবর্তী আধুনিক কবিদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তী ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। কবিদেয় মধ্যে আর পেয়েছেন প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অতুলপ্রসাদ সেন ও কাজী নজরুল ইসলাম। বিজ্ঞানীদের একমাত্র সত্যেন্দ্রনাথ বসু, চিকিৎসকদের মধ্যে একমাত্র স্যার নীলরতন সরকার, শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র নন্দলাল বসু ও কথাশিল্পীর মধ্যে একমাত্র শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অন্যান্য আর যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ ও প্রিয়পাত্র বলে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ও বিশিষ্ট

অন্তরঙ্গদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী ও আরও কয়েকজনের নাম উৎসর্গ থেকে বাদ পড়া বিশেষ লক্ষ্য করার মত।

আরও লক্ষ্য করার মত, রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা প্রথম কবিতার বই 'কবি কাহিনী' এবং জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত সর্বশেষ কবিতার বই 'জন্মদিনে' কারও নামে উৎসর্গ করে যাননি। তেমনি উৎসর্গ করেননি নোবেল পুরস্কারের খ্যাতির সহিত জড়িত বিখ্যাত বই 'গীতাঞ্জলি'। শুধু তাই নয়, 'শেষের কবিতা', 'রক্তকরবী', 'নৌকাডুবি', 'চোখের বালি', 'তিন সঙ্গী', 'চার অধ্যায়', 'মালঞ্চ', 'বাঁশরী', 'তপতী', 'লিপিকা', 'জীবনস্মৃতি', 'অরূপরতন', 'চিত্রা', 'চৈতালি', 'বনবাণী', 'মহুয়া', 'নটির পূজা' প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত বইও কারও নামে উৎসর্গ করেননি। অনুসন্ধানে আরও ধরা পড়ে, রবীন্দ্রনাথ যতগুলি বই উৎসর্গ করে গেছেন, তার প্রায় অর্ধেকই কবিতার বই।

উৎসর্গ-পত্রে নামের কবিতা লেখা আছে 'রুদ্রচণ্ড', 'বৌঠাকুরাণীর হাট', 'ভগ্নহৃদয়', 'বিসর্জন', 'ক্ষণিকা', 'পরিশেষে', 'খেয়া', বিচিত্রিতা', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী', 'খাপছাড়া', 'সে', 'কথা ও কাহিনী', 'সেঁজুতি', 'আরোগ্য' এবং 'গল্প-সল্প'-এ।

উৎসর্গ-পত্রে কারও নাম উল্লেখ না করে কবিতা লেখা হয়েছে 'চৈতালি', 'মানসী', 'মহুয়া', 'গীতালি' তে। রবীন্দ্রনাথের বই উৎসর্গ করার রীতি বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। উৎসর্গ-পত্রে উৎকৃষ্ট কবিতা যেমন আছে তেমনি আছে অনেক পদ্য যা উৎকৃষ্ট কবিতার সারিতে ফেলা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরা যেতে পারে 'কথা ও কাহিনী'র উৎসর্গপত্র। বইখানা জগদীশচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করে লেখা আছে—'সত্যরত্ন তুমি দিলে পরিবর্তে তার কথা ও কল্পনামাত্র দিনু উপহার।'

এই পদ্যের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে 'চৈতালি'র উৎসর্গ-পত্রের সার্থক কবিতা 'আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জ বনে—'। উৎসর্গরীতিতেও প্রথম ও শেষ যুগের অনেক তফাৎ। প্রথম যুগের একখানা দৃষ্টান্ত

তুলে ধরছি। 'সমালোচনা' বইয়ের উৎসর্গরীতি এইরূপ—'পূজনীয়া শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর করকমলে—স্নেহের সামান্য প্রতিদান স্বরূপ এই গ্রন্থ সাদরে সমর্পিত হইল।'

শেষ যুগের লেখা বইয়ের উৎসর্গ রীতি অন্যরকম। শ্রীমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু কিংবা কল্যাণীয় শ্রীমান সুরেন্দ্র-নাথ করকে আশীর্বাদ কিংবা 'বৌমাকে' কয়েকটি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আকর্ষণ হিসাবে আছে কবিতা। নন্দলাল বসুকে উৎসর্গ করা বইয়ের কবিতার সুরুতে লেখা আছে—'পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণ। শরৎচন্দ্রের সাতান্ন বছর বয়সের জন্মদিনে 'কালের যাত্রা' বইখানা কবির সস্নেহ উপহার।

'বিশ্বপরিচয়'-এর উৎসর্গে আছে সত্যেন বসুকে লেখা এবং 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের উৎসর্গে আছে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা তু'খানা দীর্ঘপত্র। 'আকাশ-প্রদীপ'-এর উৎসর্গে তিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে বলছেন—'আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে এই আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম।' কারণ সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য উচ্চারণ করেননি।

রবীন্দ্রনাথের বাংলায় লেখা বইগুলোই এই আলোচনায় স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নামে কোন কোন সাহিত্যিক কতগুলো বই উৎসর্গ করেছেন, তার একটা তালিকা বের করতে পারলে মন্দ হয় না।

জমিদার কবি

জমিদারী হিসাবে লেখার ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্যসৃষ্টি একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। তাঁর জীবনের মধ্যভাগে শিলাইদা থেকে পতিসর, কালীগ্রাম থেকে পতিসর সর্বত্র ছুটেছেন জমিদারী পরিচালনার কাজে, আর একই সঙ্গে লিখেছেন সোনারতরী, গল্পগুচ্ছ, অসংখ্য গান। বোটে যেতে যেতে কিংবা কুঠিবাড়িতে বসে একটি খাতার গোড়ায় লিখেছেন—'সাহাজাদপুরের সদর খাজনা॥ ১২ জানুয়ারি দেয় সদর খাজনা॥ সদর খাজনা ৪৬৭৫।/০ পথকর ১৪৭২॥/০ একুন ৬১৪৭৸৶৬ ; তারপরেই আগের দিন শুরু করা 'যেতে নাহি দিব' কবিতার খেই ধরে ওই একই খাতার তলায় লেখেন—'ছিন্নমূল তরুসম পড়ে ভূমিতলে, হতমান নতশির তবু প্রেম বলে' ইত্যাদি।

আশ্বিন মাস। শনিবার, অমাবস্যার রাত। তদুপরি প্রচণ্ড জলঝড়। রবীন্দ্রনাথ নগর নদী দিয়ে চলেছেন বোটে। প্রজাদের সুখদুঃখ শুনতে বোট লাগাচ্ছেন এঘাট থেকে ওঘাটে। মনে প্রজারঞ্জনের নানা পরিকল্পনা। তারই ফাঁকে খানিক অবসর আদায় করে লিখতে বসে গেলেন গান—'সখি প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে, তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে।' একটি নয়, এক নাগাড়ে চলে আরও অনেক গান লেখা। মাথায় নানা সুর গুনগুন করছে। 'আলেয়া রাগ সখি প্রতিদিন হায়' লেখা শেষ হতেই লিখলেন ভৈরবী ঝাঁপতালে—বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিলে, সেকি আমারি পানে ভুলে পড়িবে না।' গানের তলায় লিখে রাখলেন '১০ই আশ্বিন ১৩০৪ বাং, নাগর নদী ধানক্ষেতের ভিতর।'

বোট পোঁছল পতিসরের কাছে। ওই একই দিনে আর একটি গান লেখা হল বাঁরোয়া মূলতানে—বঁধু মিছে রাগ করোনা।'

গান তো চলছেই। তাছাড়া একই সঙ্গে চলছে গল্পগুচ্ছের সেই অনবদ্য গল্পরচনা, অসংখ্য চিঠি লেখা, কবিতা ও প্রবন্ধ সৃষ্টি এবং নিজের ছেলেমেয়ের পড়াশোনার তদারকী করা। এই সাহিত্যচর্চা কিন্তু সেই সময়ে বাহ্যত গৌণ। বিরাট জমিদারির বিপুল কাজ একা নিয়েছেন মাথায় এবং শুধু নায়েব গোমস্তাদের উপর বরাত না দিয়ে সেরেস্তার হিসাব রাখছেন নিজে। শুধু তাই নয় প্রজাদের মঙ্গলে কৃষি ব্যাঙ্ক, সমবায় ভাণ্ডার, আখের কল ইত্যাদি নানা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা মাথায় ঘুরছে। কৃষিবিশারদ বন্ধু ডি, এল রায়ের সহযোগিতায় তিনি শিলাইদহে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলুচাষে নেমেছিলেন, কিন্তু দুই কবির যুক্তপ্রচেষ্টা সত্ত্বেও আলুচাষ অর্থকরী হয়নি।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী তার 'রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের প্রজারঞ্জনের নানা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তার ভিতর থেকে একটি চিঠি উদ্ধৃত করছি। ওই একখানি চিঠিতেই জানা যায়, 'জমিদার রবীন্দ্রনাথের মন কতখানি প্রজাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিল। ১৩১৫ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ তিনি তাঁর এক কর্মচারীকে একটি চিঠিতে লিখেছেন—

'প্রজাদের অবস্থা ও উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই আদায় তহসিল করা শ্রেয়। সর্বতোভাবে প্রজাদের সহিত ধর্ম সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া তাহাদের পূর্ণ বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে হইবে। আমরা যে সর্বপ্রকারে প্রজাদের হিত ইচ্ছা করি, তোমাদের ব্যবহারে তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। প্রজাদের প্রতি যেমন ন্যায় ধর্ম ও দয়া রক্ষা করিবে, তেমনি অধীনস্থ কর্মচারীদিগকে বিশেষভাবে কর্মের শাসনে তুমি সংযত করিয়া রাখিবে। কর্মচারীদের কোনপ্রকার শৈথিল্য বা নিয়মভঙ্গ আমি কখনই মার্জনা করিব না। যাহাতে

তোমার অধীনস্থ আমলাগণ প্রশ্রয় না পাইতে পারে, এ সম্বন্ধে তোমাকে অত্যন্ত কঠিন হইতে হইবে। তুমি স্বয়ং যেরূপ অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত কাজ করিবে, তাহাদের নিকট হইতেও তেমনি করিয়া বিনা ওজরে কাজ পুরাপুরি আদায় করিয়া লইবে।'—

রবীন্দ্রনাথ কেমন সাহিত্যিক, সেই সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়েছে দেশে-বিদেশে। দিগ্‌গজ বহু সমালোচক এই বিষয়ে নানা তথ্য ও তত্ত্বের অবতারণা করে রবীন্দ্রসাহিত্যে অলৌকিকত্ব আরোপ করেছেন, কিন্তু লৌকিক জগতের জমিদার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ কেমন ছিলেন, সেই সম্পর্কে আজও বিস্তারিত আলোচনা হয়নি। আমি সামান্য দু'একটি দৃষ্টান্ত দিলাম, এবং এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করি মিস্টার ও ম্যালে আই. সি. এস সাহেবের এক মন্তব্য। এই মন্তব্য টমসন বা রটেনস্টাইনের কবি পরিচিতির চেয়ে কম মূল্যবান নয়। ম্যালে সাহেব তাঁর রাজশাহী ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ারে (১৯১৬) রবীন্দ্রনাথের জমিদারী পরিচালনা সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়েছেন। তার কিয়দংশ হচ্ছে এইরূপ ঃ—

'It must not be imagined that a powerful landlord is always oppressive and uncharitable. A striking instance to the contrary is given in the settlement officer's account of the estate of Rabindranath Tagore, the Bengali poet whose fame is worldwide. It is clear that the poetical genious he adds practical ideas of estate management, which should be an example to the lord Zemindars.

A favourable example of estate government is shown in the property of the poet, Sri Rabindranath Tagore. There are three divisions of the estate, each under a sub-manager, with a staff of Tahsildars whose accounts are strictly super vised. Half of the Dakhilas are checked by an officer of the Head office. Employees are expected to deal fairly with the

Raiyats and unpopularity earn dismissal. Remission of rent are granted, when inability to pay is proved. In 1312 (B. S.) it is said that the amount remitted was Rs. 57,595. There are Lower Primary School in each divisions, and at Patisory there is a High English School with 220 students and a charitable dispensary. These are maintained out of a fund to which the Estate contributes annually Rs. 12·50 and the Raiyats 6 pies for the rupee in their rent. There is an annual grant of Rs. 2·40 for the relief of cripples and the blind. An agricultural bank advances loans to Raiyats at 12 per cent per annum. The depositers are chiefly Calcutta friends of the poet who get interest at 7 per cent. The bank has about Rs. 90,000 invested in loans.'

আমলাদের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, প্রজাদের জন্য কৃষি ব্যাঙ্ক স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন এবং অন্ধ আতুরদের জন্য ব্যয়ের বরাদ্দ— এই সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকেই অনুমান করা যায়, রবীন্দ্রনাথের জমিদারী পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গী কত জনদরদী ও আধুনিক ছিল। প্রজাদের কাছে অপ্রিয় কর্মচারীদের বরখাস্ত করার রীতি সে যুগের জমিদারী দূরে থাক, এযুগের কোন আধুনিক রাষ্ট্রেও সচরাচর দেখা যায় না।

জননী সারদা দেবী

রবীন্দ্রসাহিত্যে উপেক্ষিতা জননী সারদা দেবী। মায়ের ছবি রবীন্দ্রনাথ বিশেষ আঁকেন নি। কবিতায় গানে মা যেখানে এসেছেন, অধিকাংশ স্থলেই এসেছেন দেশজননী রূপে। 'গোরা' উপন্যাসের আনন্দময়ীও তো আসলে ভারতমাতাই।

রবীন্দ্রসাহিত্যে মাতৃস্মৃতি দুর্লভ হওয়ার কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন, বলেছেন শৈশবে মাতৃহীন হওয়ার জন্যে মাতৃচরিত্র তাঁর সাহিত্যে মহৎ হয়ে উঠতে পারল না। রবীন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব শিষ্য অনেককে তাঁর গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন, করেননি কেবল মা'কে। বাবাকে দিয়েছেন 'নৈবেদ্য', আর এত বই থাকা সত্ত্বেও মা'র কথা মনে পড়েনি।

কিন্তু সত্যি সত্যিই কি মনে পড়েনি ? অবচেতন মনে নিশ্চয়ই পড়েছে। শৈশবে মায়ের আদর না পাওয়ার ক্ষোভ তাঁর নিশ্চয়ই ছিল, থাকারই কথা, তবে সাক্ষাৎভাবে না হোক, পরোক্ষভাবে মা রবীন্দ্রসাহিত্যের অনেক জায়গায় এসেছে। 'জীবন স্মৃতি'র সম্পাদক শ্রীনির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে নানা দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।

১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে শান্তিনিকেতন মন্দিরের এক উপদেশে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গত তাঁর একটি স্বপ্ন বর্ণনা করেন, বল্লেন— 'আমার একটি স্বপ্নের কথা বলি। আমি নিতান্ত বাল্যকালে মাতৃহীন। আমার বুড়ো বয়সের জীবনে মা'র অধিষ্ঠান ছিল না। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম, আমি যেন বাল্যকালেই রয়ে গেছি। গঙ্গার ধারের বাগানবাড়িতে মা একটি ঘরে বসে রয়েছেন। মা আছেন তো আছেন—তাঁর আবির্ভাব তো সকল সময়ে চেতনাকে অধিকার করে থাকে না। আমিও মাতার প্রতি মন না দিয়ে তাঁর ঘরের

পাশ দিয়ে চলে গেলুম। বারান্দায় গিয়ে এক মুহূর্তে আমার হঠাৎ কী হল জানি না—আমার মনে এই কথাটা জেগে উঠল যে, মা আছেন। তখন তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে বললেন, 'তুমি এসেছ!' এইখানেই স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।'

এতো গেল স্বপ্নের কথা। খুঁজলে দু'চারটে কবিতায়ও মা'কে পাওয়া যায়। ১৩২৬ সালের 'আগমনী'তে 'মাতৃবন্দনা' নামে রবীন্দ্রনাথের ছয়টি কবিতা ছাপা হয়। কবিতা হিসাবে তার সবগুলো তেমন উৎকৃষ্ট না হলেও মা হৃদয় জুড়ে রয়েছেন। যেমন—

হে জননী, ফুরাবে না তোমার যে দান,
শিরায় শোনিতে তাহা চির বহমান।
তুমি দিয়ে গেছ মোরে সূর্য তারা চাঁদ,
আমার জীবন সে তো তব আশীর্বাদ।

তাছাড়া আর একটি কবিতায় মায়ের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন—পুণ্যময়ী মাতৃভূমি / চিনায়ে দিয়েছ তুমি, / তোমা হতে জানিয়াছি নিখিল মাতারে···ইত্যাদি। ঠিক ওই একই সুরে আর একটি কবিতা—ওগো মা, তোমারি মাঝে, বিশ্বের মা যিনি / ছিলেন প্রত্যক্ষবেশে জননীরূপিনী। সেদিন যা কিছু পূজা দিয়েছি তোমায়,/ সে পূজা পড়েছে বিশ্বজননীর পায়।/ আজি সে মায়ের মাঝে গিয়েছ, মা, চলি, / তাঁহারি পূজায় দিনু তব পুষ্পাঞ্জলি।

তাছাড়া 'তোমার স্মরণ পুণ্য / করিতেছে গ্লানিশূন্য / সন্তানের মন' কিংবা 'হে জননী বসিয়াছ মরণের মহাসিংহাসনে / তোমার ভবন আজি বাধাহীন বিপুল ভুবনে···কবিতায় জননী সারদা দেবীর স্মৃতি প্রত্যক্ষভাবেই এসে পড়েছে আর 'জননী, তোমার করুণ চরণখানি, হেরিনু আজিও অরুণ কিরণ রূপে' গানটিতে দেশমাতা নয় নিজ জননীরই চরণবন্দনা করছেন রবীন্দ্রনাথ।

'জীবনস্মৃতি'র 'মৃত্যুশোক' পরিচ্ছেদেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর মায়ের

মৃত্যুর এক অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন, লিখেছেন, 'প্রভাতে উঠিয়া যখন মা'র মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম, তখন সে কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম, তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু মৃত্যু যে ভয়ংকর সে-দেহে তাহার কোন প্রমাণ ছিল না, সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে-রূপ দেখিলাম তাহা সুখতৃপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর। জীবন হইতে জীবনান্তের বিচ্ছেদ স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িল না। কেবল যখন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদর দরজার বাহিরে লইয়া গেল এবং আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকরনার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না।'

শুধু বিরাট জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ঘরকরনার মধ্যে নয়, সারদা দেবী তাঁর কনিষ্ঠপুত্রের বিশাল রচনাবলীর মধ্যে তাঁর 'আপনার আসনটিতে' এসেও বসতে পারলেন না। না পারুন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মন থেকে মায়ের স্মৃতি যে দীর্ঘদিন পরেও লুপ্ত হয়ে যায়নি, তার প্রমাণ কয়েকটি কবিতা এবং স্বপ্নের সেই ঘটনা। জননী সারদা দেবী রবীন্দ্রসাহিত্যে উপেক্ষিতা হতে পারেন, নির্বাসিতা নন।

একটি গানের জন্ম

সোনার তরী-র যুগে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শিলাইদহ অঞ্চলে, বোটে ঘুরে বেড়িয়েছেন ইছামতী, বড়ল, নাগর, পদ্মা নদীর বুকে। সেই সময় তাঁর কলম থেকে বেরিয়েছে অজস্র গান—দিনের পর দিন, একের পর এক। সেই সময়েই লেখা হয় অনবদ্য অনেক ঋতুসঙ্গীত, বিশেষ করে বর্ষার।

কিছু গান লেখা হয়েছে কোন কাটাকুটি না করেই, আবার কিছু গানে বিস্তর সংশোধন। রবীন্দ্রসাহিত্যজিজ্ঞাসুদের কাছে এই সংশোধনগুলির দাম অনেক। আরও একটি জিনিস লক্ষ্যণীয়। সেই সময় অধিকাংশ গান রচনার শুরুতে কবি রাগ ও তাল উল্লেখ করেছেন, কয়েকটিতে করেননি। বিখ্যাত অনেক হিন্দী ভাঙা গানও ঐ সময়ে লেখা। তারই মধ্যে বিশেষ একটি গানের জন্ম কী করে হল তার বিবরণ দিই।

আমার আলোচ্য গান 'হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে'। গানটি বোটে ইছামতী নদীর বুকে ঝড়বাদলার মধ্যে একটি পকেটবুকে পেনসিলে লেখা।

তার ঠিক আগেই লিখেছেন, 'কেন বাজাও কাঁকন কনকন' গানটি।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে লেখেন—'হেরি সঘন মেঘমালা গগন কোণে।' পরে 'সঘন' কেটে 'নবীন', 'মেঘমালা' কেটে প্রথমে করলেন 'নীরদঘন', তারপর 'নীরদ' বাদ দিয়ে লিখলেন 'শ্যামল', শেষের দিকের 'কোণে' বাদ দিয়ে গগন-কে 'গগনে' এবং 'গগনের' আগে জুড়লেন 'নীল'। শেষমেষ দাঁড়াল 'হেরি নবীন শ্যামল ঘননীল

গগনে।' পরে কপি করার সময় আরও কাটছাট করে দাঁড়াল- 'হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে।'

দ্বিতীয় লাইনে কাটাকুটি কম। প্রথমে লেখা হয়, 'সেই সজল আঁখি দুটি পড়িছে মনে।' কেটে করা হল 'সেই সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।' তৃতীয় লাইনে প্রথমে ছিল 'সেই অধর সুধামাখা মিনতি ব্যথা আঁকা।' 'সুধা'র বদলে এল 'করুণা', 'ব্যথা'-র বদলে 'বেদনা' এবং দাঁড়াল 'সেই অধর করুণামাখা, মিনতি বেদনা আঁকা। চতুর্থ লাইনে কাটাকুটি আরও কম। 'চেয়ে' প্রথমে লিখে কেটে করলেন 'চাহিয়া' এবং লাইনটি দাঁড়াল এই রকম--'নীরবে চাহিয়া থাকা বিদায় খনে'। পঞ্চম লাইনে আবার বিস্তর সংশোধন, ঠিক প্রথম লাইনের মত।

ষষ্ঠ লাইন প্রায় সংশোধনহীন। 'আজি ঝরঝর ঝরে জল বিজুলি হানে' লিখে পরে 'আজি' শব্দটি ছাঁটাই করা হয়। সপ্তম লাইনে গোড়ায় ছিল—'বনে ব্যাকুল পবন ছোটে আকুল গানে।' 'ব্যাকুল' কাটা গেল, কাটা গেল 'আকুল' এবং 'ছোটে'। তার বদলে দাঁড়াল 'বনে পবন মাতিয়া ওঠে পাগল গানে।' কপি করে গীতবিতানে যখন এল, তখন তার রূপ হল একটু অন্যরকম— 'পবন মাতিছে বনে পাগল গানে।' অষ্টম লাইনে প্রথমে ছিল, 'আমার পরাণপুটে, কোনখানে ব্যথা ফুটে।' পরে 'আমার' কেটে করলেন 'গোপন' এবং তার আগে বাড়তি ঢোকালেন 'মম'। গীত-বিতানে কিন্তু আছে 'আমার পরাণপুটে কোনখানে ব্যথা ফুটে।'

নবম লাইনের অসংশোধিত রূপ হচ্ছে—'বিলাপ বাজিয়া উঠে হৃদিগগনে।' 'বিলাপ বাজিয়া' বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার উপরে লিখলেন 'কার কথা বেজে' এবং 'হৃদিগগনে' কেটে করলেন—'হৃদয় কোণে'। দশম ও শেষ লাইনে প্রথম ও পঞ্চম লাইনের সামান্য পরিবর্তন করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'হেরি সঘন নীরদমালা গগন কোণে।' কেটে আনলেন প্রথম ও পঞ্চম লাইনের আকার—

'হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে।'

আর একটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। প্রথম রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ প্রায় প্রত্যেক লাইনের আগে 'হেরি', 'সেই', 'আজি', 'বনে', 'মম' ইত্যাদি বাড়তি শব্দ রেখেছিলেন ; কিন্তু মুদ্রিত আকারে গানটি যখন পাওয়া গেল, তখন একমাত্র দ্বিতীয় লাইনের বাড়তি 'সেই' শব্দটি ছাড়া আর সব বাদ গিয়েছে। বর্তমানে গানটির মুদ্রিত রূপ হল--

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
সেই সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।
অধর করুণা মাখা মিনতি বেদনা আঁকা
নীরবে চাহিয়া থাকা বিদায় খনে॥
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে।
ঝরঝর ঝরে জল বিজুলি হানে,
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে।
আমার পরাণপুটে, কোনখানে ব্যথা ফুটে
কার কথা জেগে উঠে হৃদয় কোণে॥
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে।

‘আহা’—রবীন্দ্র সঙ্গীতে

সেদিন রেকর্ডে গান শুনছিলাম ‘ফাগুনের নবীন আনন্দে’। ‘আনন্দের’ শেষ রেশটুকু শুনে কেমন যেন খটকা লাগল। স্বরলিপিতে কী আছে জানিনে, কিন্তু আগে এমন তো শুনিনি। রেকর্ডে ‘আনন্দে-’র ‘দে’ অংশটুকু টেনে গাওয়া হয়েছে ‘দে এ-এ-এ-এ’। সেটাই স্বাভাবিক, যেমন ‘এবার তোর মরা গাঙে’ গানটি গাইতে গেলেই শুরু করা হয় ‘ঈ-ঈ’ এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে জয় মা বলে ভাসা তরী’। এই ‘ঈ’ সংযোজনটি আসলে পংক্তির শেষ শব্দ ‘তরী-র শেষ ‘সিলেবল’ ‘ঈ’র ভগ্নাংশ। ঠিক তেমনি ‘ফাগুনের নবীন আনন্দে’ গানে প্রথম কলিতে ফিরে আসার সময় শেষ সিলেবল ‘দে’-র ‘এ’ ধ্বনিটিই ফিরে আসার কথা। কিন্তু শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আমল থেকে বরাবর গাওয়া হয়ে থাকে অন্যভাবে। ‘এ-এ-এ-এ’ না বলে বলা হয় ‘আ-আ-আ-আ’। অর্থাৎ ফাগুনের নবীন আনন্দে আ-আ-আ-আ, ফাগুনের…।

এই ‘আ’-উচ্চারণ প্রথম শব্দ ‘ফাগুনের’ ‘ফা’-এর ‘আ’ নয়, ওটা ‘আহা’ শব্দেরই কোমলীকৃত রূপ। উচ্চারণের দিক থেকে ‘এ-এ-এ-এ-এ’ স্বাভাবিক হওয়া সত্ত্বেও গানের মূলভাব প্রকাশের জন্য তার বদলে ‘আ-আ-আ-আ’-ই সঙ্গতভাবে এসেছে। কেন এসেছে বলছি।

একটু নজর দিলেই দেখা যাবে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের যেখানেই আনন্দের প্রকাশ, সেখানেই ‘আহা’ শব্দ প্রায়ই উল্লেখিত হয়েছে, কিংবা গানের কথার মধ্যে না থাকলেও উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। ‘আহা’ শব্দ দিয়ে শুরু, এমন কয়েকটি গান এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার মত। ‘শ্যামা’ নৃত্যনাট্যের শুরুতে বজ্রসেনকে দেখে মুগ্ধা শ্যামা

পুলকে যে গান গেয়ে ওঠে, তার শুরু 'আহা' দিয়ে—'আহা মরি মরি মহেন্দ্র নিন্দিত কান্তি উন্নত দর্শন।' ওই নৃত্যনাট্যেরই শেষাংশে নানা ঘটনার টানা-পোড়েনের পর শ্যামাকে পেয়ে আনন্দে অধীর বজ্রসেন প্রথম যে গান গায়, তারও শুরু 'আহা' দিয়ে—'আহা এ কী আনন্দ, হৃদয়ে দেহে ঘুচালে মম সকল বন্ধ।'

আরও আছে। 'আহা আজি এ বসন্তে' 'আহা জাগি পোহালে বিভাবরী' 'আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা' ইত্যাদি গানে ওই একই আনন্দের অভিব্যক্তি। এইরূপ অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে অন্যভাবে অন্য গানেও। 'মোর পাথিকেরে বুঝি এনেছ' গানটির কথাই ধরা যাক। এই গানের কোথাও 'আহা' শব্দটি লেখা নেই, কিন্তু 'সে যে সাগর পারের বাণী, মোর পরানে দিয়েছে আনি' গাওয়ার পর নতুন কলি 'তার আঁখির তারায় যেন গান গায়' শুরু করার আগে অনিবার্যভাবে 'আ-হা' এসে পড়েছে। অকারণ অশ্রু সলিলে দু নয়ন ভরে যাওয়া সত্বেও এ'গান শুনলে সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয় বিরহের বেদনায় নয়, মিলনের আনন্দে। কান্না বুক ফেটে বেরোতে চায়, শোকে নয়, আনন্দের আবেগে।

'ওগো দখিন হাওয়া' গানটিতে 'আহা' শব্দের ব্যবহার দু'বার, কিন্তু সাধারণভাবে বিচার করতে গেলে একবারও তার প্রয়োজন ছিল না। অথচ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল অন্য কারণে। বসন্তে 'নূতনপাতার পুলক ছাওয়া' পরশের বর্ণনা সুরে দিতে গেলে 'আহা' ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ গান যিনিই শুনেছেন, তিনিই স্বীকার করবেন, 'ওগো দখিন হাওয়া গানটিতে 'আহা' শব্দটি বারবার ঘুরে এসে কী মাদকতার সৃষ্টিই না করে।

দৃষ্টান্ত অসংখ্য, তবে আমার বক্তব্য এই নয় যে, আনন্দ প্রকাশের সব গানেই 'আহা' শব্দ রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন। তা' করেননি, করলে মুদ্রাদোষ দাঁড়াত। বিশেষ বিশেষ গানে 'আহা' শব্দের প্রয়োগ করেই তিনি এক অমবদ্য রসের সৃষ্টি করেছেন। সাধারণত

'আহা' শব্দটি আক্ষেপ বা দুঃখের কারণেই আমরা ব্যবহার করি, অক্ষম কবিরা অকারণে 'আহা' কিংবা 'হায়' লাগিয়ে ছন্দ পতন রোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ তার বদলে 'আহা' শব্দটিকে তুলে নিয়েছেন অন্য স্তরে, দিয়েছেন নতুন বিস্তার। এই বিস্তার নিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ বিশদ আলোচনা করতে পারেন। আমার এই লেখা শুধু সংক্ষেপিত সূত্র সন্ধান।

রবীন্দ্রনাথ ও সাংবাদিকতা

সাংবাদিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি জগৎজোড়া না হলেও বাংলাজোড়া ছিল। সাধনা, বঙ্গদর্শন, ভারতী, বালক প্রভৃতি নানা কাগজের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে। বাংলা দেশের দৈনিক সংবাদপত্রগুলির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। সাংবাদিকদের কাছে তিনি শুধু 'সংবাদই' ছিলেন না—নানাভাবে নানাক্ষেত্রে তাঁর মূল্যবান উপদেশও তাঁরা পেয়েছেন। বিশেষ করে বাংলা দৈনিকের কাজকর্মে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে।

অনেক সময় ভাবি, রবীন্দ্রনাথ যদি কোন বাংলা-দৈনিকে সাংবাদিক হিসেবে কিছুদিন কাজ করতেন, তাহলে কী হ'ত? রবীন্দ্রনাথের নিজের কোন উপকার হোক আর নাই হোক, সংবাদ-সাহিত্য যে তাঁর হাতের স্পর্শে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখনকার খবরের কাগজের কর্মীরা রবীন্দ্রনাথের তৈরী ভাষার পাকা সড়কে তরতর এগিয়ে যেতে পারতেন, প্রতিশব্দ আর বাক্য প্রয়োগের গোলকধাঁধায় পড়ে ক্লান্ত হতেন না।

আশ্চর্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথ নিজে রিপোর্টার বা সাব-এডিটার না হয়েও তাঁদের পেশাগত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, তাঁদের কাজের গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করেছেন, এমনকি ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টাও করেছেন। অর্থাৎ সংবাদপত্রের এই দিক দুটির প্রতি তিনি আদৌ উদাসীন ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথ বাছা বাছা কয়েকখানি খবরের কাগজ পড়তেন। শেষ জীবনে অন্যতম সঙ্গী ছিল আনন্দবাজার পত্রিকা। তাঁর রচনার বহু জায়গায় 'আনন্দবাজারের' উল্লেখ আছে। প্রহাসিনী, গল্পসল্প—অনেক বইয়ে।

তাছাড়া কার কোন কাগজ পড়া উচিত সেই সম্পর্কেও মাঝে

মাঝে উপদেশ দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৩১৪ সনে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা অভিভাবক রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠির উল্লেখ করি। তাতে তিনি লিখছেন—(ইংরেজী) কাগজের চাঁদা, ফুরলেই আর পাঠাব না। এখন থেকে 'বন্দেমাতরম্' কাগজ পাঠাতে থাকব। ওটা খুব ভাল কাগজ হয়েছে।'

রবীন্দ্রনাথ আনন্দবাজার পত্রিকা যে খুঁটিয়ে খুটিয়ে পড়তেন তার প্রমাণ অনেক জায়গায় রয়েছে। প্রয়োজনের তাগিদে অতিরিক্ত তাড়াহুড়োয় সংবাদ-পত্রের অফিসে তৈরী এবং পরে চালু কয়েকটি বাংলা শব্দ সম্পর্কে তিনি আপত্তি জানিয়েছেন। তৎপরিবর্তে অন্য শব্দ ব্যবহারের সুপারিশ পর্যন্ত করেছেন।

বাংলা খবরের কাগজের সাংবাদিকদের চিরন্তন সমস্যা ইংরেজী শব্দের জুৎসই বাংলা প্রতিশব্দ নিয়ে। পদে পদে বিপদ। রবীন্দ্রনাথ যদি কোন বাংলা পত্রিকায় স্টাফ রিপোর্টারের কাজ করতেন, তাহলে অনুমান করতে পারি—প্রথমদিন কাজে যোগ দিয়েই বলতেন—ঐ রিপোর্টার শব্দটি সম্পর্কেই আমার আপত্তি। বাংলা খবরের কাগজে এ অচল।' এবং ভাবতে অবাক লাগে, রিপোর্টার কোনদিন না হয়েও রবীন্দ্রনাথ সত্যি-সত্যিই রিপোর্ট এবং রিপোর্টারের বাংলা প্রতিশব্দ অনেক কষ্টে খুঁজে বের করেছিলেন।

তিনি লিখছেন—'হঠাৎ মনে পড়ল, কাদম্বরীতে আছে প্রতিবেদন,—আর ভাবনা রইলো না। 'প্রতিবেদন', 'প্রতিবেদিত', 'প্রতিবেদক' যেমন করেই ব্যবহার করো, কানে বা মনে কোথাও বাধে না।'—রিপোর্ট, রিপোর্টেড এবং রিপোর্টারের এমন চমৎকার বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে বের করা বোধহয় একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব।

খবরের কাগজে দ্রুত-সৃষ্ট শব্দাবলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি সব চেয়ে বেশী ছিল,—'বাধ্যতামূলক শিক্ষা', 'নবতম অবদান', 'অন্তরীণ', 'পরিস্থিতি, 'সম্পাদকীয় স্তম্ভ', 'কৃষ্টি' ইত্যাদি কয়েকটি শব্দ

নিয়ে। তাছাড়া খবরের কাগজে বহুল-ব্যবহৃত—'অভিনয়ে অমুক অমুক অংশ গ্রহণ করবেন'—বাক্যাংশটি যে ইংরেজি 'উইল টেক পার্টে'র অক্ষম অনুবাদ, সে কথাও রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। টিয়ার-গ্যাস শব্দের বাংলা করা হয়েছে, 'কাঁদুনে গ্যাস।' কিন্তু এই গ্যাস নিজে কাঁদে না—অপরকে কাঁদায়। তাই রবীন্দ্রনাথের মতে 'টিয়ার-গ্যাসে'র বাংলা হওয়া উচিত 'কাঁদানে-গ্যাস।' 'কাঁদুনে-গ্যাস নয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে সর্বাপেক্ষা 'কদর্থ শব্দ' 'বাধ্যতাধূলক শিক্ষা'। তিনি বলেন, কম্পালসারী এডুকেশনের বাংলা হওয়া উচিত 'অবশ্য-শিক্ষা'। 'অন্তরীণ' শব্দটি সম্পর্কে তাঁর আপত্তি অন্য কারণে। তিনি এক জায়গায় লিখছেন—'কিছুকাল পূর্বে ভারত-শাসনকর্তারা 'ইন্টার্ন' শুরু করলেন তখন খবরের কাগজে তাড়াতাড়ি একটি শব্দ সৃষ্টি হয়ে গেল—'অন্তরীণ'। শব্দ-সাদৃশ্য ছাড়া এর মধ্যে আর কোন যুক্তি নেই। বিশেষণে ওটা কী হতে পারে, তাও কেউ ভাবলেন না। এক্সটার্নমেন্টকে কি বলতে হবে 'বহিরীণ?' অথচ অন্তরায়ণ, অন্তরায়িত (ইন্টার্নর্ড), বহিরায়ণ, বহিরায়িত ব্যবহার করলে আপত্তির কারণ থাকে না, সকল দিকে সুবিধাও ঘটে।'—ধাতুগতভাবে ব্যাকরণগতভাবে নিরর্থক 'পরিস্থিতি' শব্দের প্রয়োগ ও 'অবদান' শব্দের অপপ্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর আপত্তি সর্বজনবিদিত।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, প্রতিশব্দ সৃষ্টির ব্যাপারে সংস্কৃতের সাহায্য নেওয়া উচিত। কারণ ইংরেজীতে যে সব শব্দ অত্যন্ত সহজ ও নিত্য প্রচলিত, দরকারের সময় বাংলায় তার প্রতিশব্দ সহসা খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন তাড়াতাড়ি যা হয় একটা বানিয়ে দিতে হয়। সেটা অনেক সময় বেখাপ হয়ে দাঁড়ায়; অনেক সময় মূল ভাবটা ব্যবহার করাই স্থগিত থাকে। অথচ সংস্কৃত ভাষায় হয়ত তার অবিকল বা অনুরূপ ভাবের শব্দ দুর্লভ নয়।

এই প্রসঙ্গে খবরের কাগজের ভাষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'ঠাট্টার'

একটি উদাহরণ দিই তাসের দেশ নাটিকা থেকে। এই বইয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি সম্পাদক চরিত্র জুড়ে দিয়েছেন। তাসের দেশের উদ্ধৃতিটি নিম্নরূপ—

রাজা—ওহে ইস্কাবনের গোলাম।

গোলাম—কী রাজাসাহেব?

রাজা—তুমি তো সম্পাদক।

গোলাম—আমি তাসদ্বীপপ্রদীপের সম্পাদক। আমি তাসদ্বীপের কৃষ্টির রক্ষক।

রাজা—কৃষ্টি! এটা কি জিনিস? মিষ্টি শোনাচ্ছে না তো?

গোলাম—না মহারাজ, এ মিষ্টিও নয়, স্পষ্টও নয়, কিন্তু যাকে বলে নতুন—নবতম অবদান। এই কৃষ্টি আজ বিপন্ন।

সকলে—কৃষ্টি, কৃষ্টি, কৃষ্টি।

রাজা—তোমার পত্রে সম্পাদকীয় স্তম্ভ আছে তো?

গোলাম—দুটো বড় বড় স্তম্ভ।

রাজা—সেই স্তম্ভের গর্জনে সবাইকে স্তম্ভিত করে দিতে হবে। এখানকার বায়ুকে লঘু করা সইব না।

গোলাম—বাধ্যতামূলক আইন চাই।

রাজা—ওটা আবার কি বললে? বাধ্যতামূলক আইন!

গোলাম—কান-মলা আইনের নব্য ভাষা। এও নবতম অবদান।

কৃষ্টি, নবতম অবদান, সম্পাদকীয় স্তম্ভ, বাধ্যতামূলক আইন প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করার মত।

রবীন্দ্রনাথ খবরের কাগজের ব্যস্তবাগীশ লোকদের জন্যে একান্ত প্রয়োজন ইংরেজীর অনেকগুলি বাংলা প্রতিশব্দ আমাদের উপহার দিয়েছেন। তার কয়েকটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি। যথা—charred—অঙ্গায়িত, over population—অতিপ্রজন, foothpath—একায়ন, body guard—ঐকাঙ্গ, apathy—অনীহা, dissolved—প্রলীন, for show—প্রেক্ষার্থ, out of order—বিক্রম,

original—মৌল, self sufficiecy—স্বয়ম্ভর ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের লেখা অনুবাদ চর্চা বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নবাগতদের একখানা অবশ্য-পাঠ্য বই। ইংরেজীতে লেখা সংবাদ কি করে বাংলায় অনুবাদ করতে হয়, তার অনেক উদাহরণ আছে বইটিতে। ১৯১৭।১৮ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের 'ইস্কুল মাস্টার' তখন প্রধানত অন্য প্রদেশের ছাত্রদের জন্যে কলকাতার ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র থেকে তার বাংলা অনুবাদ দেখাতেন কিভাবে তর্জমা করতে হয়। তিনি স্টেটসম্যান, ইংলিশম্যান, বেঙ্গলী, প্রভৃতি কাগজ থেকে সংবাদ বেছে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কাজ নিজেই করতেন। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনূদিত একটি বাংলা সংবাদ নীচে দিলাম। কয়েকটি বিশেষ শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়—

"৩১শে অক্টোবর সমাপিত সপ্তাহে অল্প কয়েকস্থানে লঘু বৃষ্টিপাত হইয়াছে। সমস্ত প্রদেশে আরও অধিক বৃষ্টির আশু প্রয়োজন। কোন কোন জিলায় আমন ধান শুকাইতেছে বলিয়া প্রতিবেদন করা হইয়াছে। উত্তর এবং পশ্চিম বাংলার শস্যের ভাবী অবস্থা সাধারণতঃ আশাজনক নহে। অন্যত্র ভাবী অবস্থা মাঝামাঝি রকম। রবি-শস্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা চলিতেছে। বৃষ্টির অভাবে বীজ বপনের ব্যাঘাত ঘটিতেছে। এই প্রদেশের মোটা চালের গড়মূল্য পূর্ব সপ্তাহেব তুলনায় শতকরা হারে মাত্র দুই টাকা বাড়িয়াছে।"

এই ধরনের সংবাদ রিপোর্টার সাব-এডিটারদের প্রায়ই রচনা করতে হয়। সহজে বোধগম্য এমন ঝরঝরে বাংলা বের করতে অনেককে গলদঘর্মও হতে হয়। উইক এণ্ডিং অন থার্টিফার্স্ট অক্টোবর—এই বাক্যাংশটি বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে এখনও প্রায়ই লেখা হয়ে থাকে—"৩১শে অক্টোবর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে। অথচ রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে কী সুন্দর লিখেছেন—৩১শে অক্টোবর সমাপিত সপ্তাহে।

রবীন্দ্রনাথের রচনা আর একটি বাংলা সংবাদ দিয়ে প্রবন্ধটি শেষ করি। এই সংবাদটি এক দুর্ঘটনার—

"এইরূপ প্রকাশ যে গগন মণ্ডল বলিয়া কোন একজন বজবজের চালের ব্যবসায়ী এক দেশী নৌকায় একটা বড় রকমের চালের চালান লইয়া কলিকাতায় আসিতেছিল এবং পোজালি খাল বলিয়া হুগলী নদীর এক খালের মধ্যে রাত্রের মত নোঙর করিয়াছিল। মালিক এবং দাঁড়-মাঝিরা যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, এমন সময় কে একজন আগুন চাহিতেছে শুনিয়া তাহারা জাগিয়া উঠিল। এইরূপ হঠাৎ ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া মাল্লাদের ধাঁধা লাগিয়া গেল। তাহারা প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিল না। ইতিমধ্যে বিপরীত দিক হইতে অন্য দুইটি নৌকা উপস্থিত হইল। তাহাদের আরোহীরা চালের নৌকার লোকদিগকে মারিতে আরম্ভ করিল এবং ইহারা ভয়ে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। ডাকাতেরা সমস্ত মাল নৌকায় তুলিয়া লইল এবং দ্রুতবেগে দাঁড় বাহিয়া চলিয়া গেল।"

শান্তিনিকেতনে অভিনয়

মনে আছে, বেশ কয়েক বছর আগে এক ভদ্রলোক শান্তিনিকেতন বেড়াতে এসে সেখানকার বিরাট খেলার মাঠ ও খেলাধুলোর জনপ্রিয়তা দেখে চোখ দুটো কপালে তুলেছিলেন। বলেছিলেন, 'সে কি মশাই, এখানে খেলার পাটও আছে নাকি? আমি তো জানতুম—'

ভদ্রলোকের চোখ কপাল থেকে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনতে আমি তৎক্ষণাৎ সাহায্য করি। শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে তাঁর বদ্ধমূল ধারণাকে চট করে লুফে মাঝপথেই সংযোজন করি—'আপনি জানতেন, এখানে কেবল চলে ইনিয়ে বিনিয়ে কবিতা লেখা, নাকি সুরে গান আর অষ্টপ্রহর মণিপুরি কথাকলির ধেই ধেই। ফুটবল-ক্রিকেটের নামও শোনেনি এখানকার ছেলেমেয়েরা, এই তো! তা, আজ্ঞে, আপনার জ্ঞাতার্থে জানাই, কলকাতার অনেক বাঘা বাঘা ফুটবল টিম এখানে এসে ঘায়েল হয়ে গেছেন, ক্রিকেট-হকি-টেনিস-ভলিবল, কোন খেলাতেই এ জায়গা কম যায় না।'

এই ভদ্রলোকটি একক নন, এই রকম আরও অনেকের মনে এই ধরনের আজগুবি ধারণা রয়েছে শান্তিনিকেতন সম্পর্কে। তাঁদের ভুল ভাঙে জায়গাটায় দু-চারদিন থাকলে।

বাইরের লোকের আর একটি ধারণা যে, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের নাটক ছাড়া আর কিছুই অভিনয় হয় না।—এটিও মিথ্যে।

রবীন্দ্র-প্রভাবে পুষ্ট শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের নাটক বেশী অভিনীত হবে—এ তো সোজা বাংলা কথা। রবীন্দ্রনাথকে দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলার দায়িত্ব তো শান্তিনিকেতনেরই বেশী। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ছিলেন পাকা অভিনেতা। তাঁর সংস্পর্শে এসে সেখানকার

লোকদের মধ্যে সহজেই গড়ে উঠেছে সহজাত অভিনয়-ক্ষমতা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেনও নানা রকম নাটক, খুশীমত যখন-তখন করা যায় এবং সেই কারণে হয়ও। তবে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আরও অনেকের নাটকও সেখানে অভিনীত হয়েছে।

দেখা গেছে, রবীন্দ্রনাথের নাটক ছাড়া আর যে-সব বাংলা নাটক জনপ্রিয়তা পেয়েছে, তার প্রায় সব ক'টাই হাস্যরসের। এর কারণ হয়তো শান্তিনিকেতনের লোকদের প্রবণতা ওই কৌতুক-রসের দিকেই। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও নৃত্যনাট্যের পর বেশী মঞ্চসফল হয় বৈকুণ্ঠের খাতা, চিরকুমার সভা, শেষরক্ষা ইত্যাদি।

বাইরের নাট্যকারদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদ-প্রসাদ বা শচীন সেনগুপ্তের নাটক কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে কখনও হয়েছে বলে আমি শুনিনি। কলকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চের প্রেক্ষাগৃহ যে-সব নাট্যাভিনয়ে করতালি উচ্ছ্বসিত হয়েছে, সে-সবের অভিনয় সেখানে সম্ভবও নয়। কারণ, সেখানকার অভিনয়-রীতির জাত একেবারে আলাদা,—অতি-নাটকীয়তার স্থান আদৌ ছিল না।

মেলাতে গিয়ে দেখছি, রবীন্দ্র-নাট্য ছাড়া শান্তিনিকেতনে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছে পরশুরাম-রচিত কয়েকটি গল্পের নাট্যরূপ। যেমন বিরিঞ্চিবাবা, লম্বকর্ণ, চিকিৎসাসঙ্কট, রাতারাতি, ভুশণ্ডীর মাঠে, ইত্যাদি। লম্বকর্ণের নাট্যরূপ দেন অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং। লম্বকর্ণ ও ভুশণ্ডীর মাঠে অভিনীত হয়েছে সর্বাধিক এবং দুটোই কলকাতা শহরেও করা হয়েছে কয়েকবার।

বছর ষোল আগে একবার হয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একখানা নাটক, হয় প্রমথনাথ বিশীর ঋণং কৃত্বা ও ঘৃতং পিবেৎ। বনফুলের লেখা দু-একটি নাটকের যেমন, কবয়ং, অভিনয়ও দেখেছি। তাছাড়া, প্রায়ই হয় সুকুমার রায়ের হ-য-ব-র-ল এবং লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

রবীন্দ্রনাথের লেখা ইংরেজী নাটক এবং শেক্সপীয়ার বার্নার্ড শ-এর

ইংরেজী নাটকও হয়েছে অনেকবার। তার মধ্যে জনপ্রিয় ওথেলো ও অ্যাণ্ড্রোক্লিস অ্যাণ্ড দি লায়ন। একটি হিন্দী নাটক হয় ১৯৪৫ সালে—প্রেমচাঁদের 'সতরঞ্চ কী খিলাড়ি'। সংস্কৃত নাটক হয়েছে অনেকবার। সর্বশেষ দেখেছি ১৯৫২ সালে কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্। তার আগে শুনেছি অস্ট্রীয়ান মহাপণ্ডিত ভিণ্টারনিৎস্‌কে দেখানোর জন্যে অভিনীত হয় শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকম্। স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন একালের রবীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞ অনাদিকুমার দস্তিদার।

১৯৫৭ সালে একবার অভিনয়ের ব্যবস্থা হয় একটি গ্রীক নাটকের। নাটকটি শেষ-মেষ অভিনীত হয় না। একদিন রিহার্সেলেই হয়ে যায় ট্র্যাজেডী। সেই ট্র্যাজেডিতে প্রধান ভূমিকা নেন শিল্পী শ্রীরামকিঙ্কর এবং তৎকালীন ইংরেজীর অধ্যাপক শ্রীসুধীন ঘোষ। ওই নাটক রিহার্সেলের সময় একটি ঘটনা এত তিক্তরূপ নেয় যে, সারা ভারত জুড়ে হয় দারুণ হৈ-চৈ এবং সুধীন ঘোষকে চিরকালের জন্য ছাড়তে হয় শান্তিনিকেতন।

মোট কথা, নাটক-অভিনয়ের ব্যাপারে শান্তিনিকেতন দরাজ দিল। রবীন্দ্রনাথের লেখা নয় বলে কোন আপত্তি ওঠেনি কখনও। শুধু যেখানে রুচির অভাব, সেইখানেই আপত্তি। এমনকি ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা নাটকও অভিনয় করতে দেওয়া হয়। বহু বছর আগে তখনকার ছাত্রী এবং এখনকার নামকরা সাহিত্যিক মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের (ঘটক) একটি নাটক (সম্ভবত নাম 'সাতভাই চম্পা') অভিনয় হয়। বছর দশেক আগে এই অধমের লেখা একখানা নাটকও ('তেপান্তরের মাঠে') কর্তৃপক্ষ বরদাস্ত করেছেন।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের যে-সব নাটক অভিনীত হয়, বলা বাহুল্য, বেশী সমাদৃত হয় চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, প্রভৃতি নৃত্যনাট্য। তারপর কদর বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া, তাসের দেশের। মায়ার খেলা এবং শাপমোচন ইদানীং বড় কম অভিনীত হচ্ছে।

অন্য নাটকের মধ্যে প্রায়ই হয় অরূপরতন, মুক্তধারা, ডাকঘর।

রক্তকরবী হয়েছে বার দুই। রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় রক্তকরবী হয়েছে বলে মনে পড়ছে না। 'নন্দিনী' চরিত্রের জন্যে তাঁকে খোঁজাখুঁজি করতে হয় অনেক জায়গায়। রক্তকরবী আমি প্রথম দেখি ১৯৪৬ সালে। কান্তিচন্দ্র ঘোষ ও নন্দলাল বসু দুজনে মিলে পরিচালনা করেন। বাঁশরী নাটকটিও সেখানে রবীন্দ্রনাথের জীবিতা-বস্থায় হয়নি। প্রথম হয় ১৯৪৫ সালে। তারপর হয়েছে আর একবার। ১৯৫৫ সালে।

রবীন্দ্রনাথের কৌতুক-নাট্যের মধ্যে বৈকুণ্ঠের খাতা ও শেষরক্ষা নিয়ে টানাটানি পড়ে প্রায়ই। এবং এই সব নাটকের অভিনয়ই হয় অনবদ্য। 'গোরা' হয়েছিল একবার, শ্রীনিকেতেন। তাছাড়া লক্ষ্মীর পরীক্ষা স্কুলের মেয়েরা করে সুযোগ পেলেই। 'হাস্য-কৌতুকে' ও 'ব্যঙ্গ-কৌতুকে'র ছোট নাটকগুলোও বাদ যায় না।

এই হচ্ছে মোটামুটি অভিনয়ের খতিয়ান। তার মধ্যে কিছু নাটক হয় কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায়। সেগুলো একেবারে সরকারী ছাপমারা এবং হয় বিভিন্ন উৎসবে, অনুষ্ঠানে। কিন্তু সেটাই একমাত্র নয়, বিভিন্ন বিভাগ বা ব্যক্তির চেষ্টায়ও যখন-তখন নাটক নামানো হয়। এবং এই একটিমাত্র জায়গা, যেখানে স্বল্পমেয়াদী নোটিসে নাটক নামানো সম্ভব। ঝামেলা বিশেষ নেই। নাটক বাছাই করেই পাত্র-পাত্রী বাছাই। গান বা নাচের ভার দিতে হবে সংগীত-ভবনের উপর এবং মঞ্চ-সজ্জা ও চরিত্র-সজ্জার ভার কলাভবনের উপর। তার পর একদিন অভিনয়ের তারিখ ঘোষণা। অভিনয়ের জন্যে ছিল তিন-চারটে জায়গা, সিংহ-সদন, লাইব্রেরি-বারান্দা, সংগীত-ভবন ইত্যাদি। বিকেল হলেই কলাভবনের ছেলেমেয়েরা লেগে গেল মঞ্চ সাজতে। পড়ল নির্দিষ্ট সময়ের ঘণ্টা। ব্যস্, সবাই হয়ে গেল হাজির ; দর্শকের কমতি নেই।

শান্তিনিকেতনের অভিনয় ও মঞ্চ-সজ্জার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের পরই সবচেয়ে বেশী দান নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর, বিনায়ক

মাসোজি ও রামকিঙ্করের। তাঁদেরই অনলস পরিশ্রম ও চিন্তার ফসল আজকের এই প্রতিকী মঞ্চরীতি। বিশেষ লক্ষণীয় যে, চিত্রশিল্পে অ্যাবস্ট্র্যাক্‌ট্‌ আর্টকে শান্তিনিকেতন বিশেষ প্রাধান্য না দিলেও (ব্যতিক্রম রামকিঙ্কর) মঞ্চ-সজ্জায় ওই আর্টেরই জয়-জয়কার। অন্যদিক থেকে নাচ-গান ও অভিনয়ের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি দান শান্তিদেব ঘোষের। প্রতিমাদেবীও বরাবর অভিনয়ে উৎসাহ দেখিয়েছেন। ১৯৪৪ সালে আমার দেখা প্রথম ডাকঘরের প্রযোজক ছিলেন তিনিই।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে শান্তিনিকেতন এবং শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা—বঙ্গদেশীয় আধুনিক অভিনয় ও মঞ্চ-রীতির এই বিবর্তন ও আবর্তন সম্পর্কে আলোচনা বিশেষ হয়নি। হওয়া উচিত।

চার অধ্যায় প্রসঙ্গে

চার অধ্যায় নিয়ে প্রায়ই কথা ওঠে। বইটি ছাপার পরই সমালোচনার প্রবল ঝড় বয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের শততম জয়ন্তীতে পর্যন্ত আবার সেই ঝড়ের সঙ্কেত পাওয়া যায়।

শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, উপাধি-ধারীদের পক্ষ থেকে মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, জমিদার সভার পক্ষ থেকে রাজা প্রফুল্লকুমার ঠাকুর এবং সরকারের পক্ষ থেকে শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ হয়ত কবিকে অনুরোধ করেছিলেন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একটা কিছু লিখে দিতে। এবং 'চার অধ্যায়' উপন্যাস সেই অনুরোধের পরিণাম।

এই বিবরণের সত্যতা নির্ধারণের জন্যে আমি খোঁজখবর নিই। শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দকে জিজ্ঞেস করি। এ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এমন কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলে আরও জানতে পেরেছি, মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দশ বছর কখনও দেখা হয়নি। রাজা প্রফুল্লকুমারের সঙ্গেও নয়। রাজা তাঁর বরানগরের বাগান বাড়ির আম প্রতি বছর পাঠাতেন এবং রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে ধন্যবাদ জানতেন, কিন্তু শেষ দশ বছরের মধ্যে এঁদের দুজনের মধ্যেও দেখা হয় নি।

চার অধ্যায় রচনার পটভূমি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল শ্রীঅনিলকুমার চন্দ। তিনি কবির শেষ জীবনের একান্ত সচিব। তাঁর সঙ্গে কলকাতায় এ বিষয় নিয়ে আমি আলাপ করেছি। তিনিও স্যার প্রদ্যোৎকুমার ও রাজা প্রফুল্ল ঠাকুরের সঙ্গে কবির শেষ দশ বছরে সাক্ষাৎ না হওয়ার কথা সমর্থন করেন।

শ্রীঅনিলকুমার চন্দের কাছ থেকে চার অধ্যায় রচনা সম্পর্কে যে তথ্য জোগাড় করেছি, তা রবীন্দ্রানুরাগীদের কাছে কৌতূহলোদ্দীপক হবে এবং অনেক রকম সংশয়ের নিরসনও করতে পারবে।

১৯৩৪ সনে রবীন্দ্রনাথ 'ইনচাঙ্গা' নামক জাহাজে সিংহল যান। সঙ্গে শান্তিনিকেতনের অভিনয়ের দল। ব্যবস্থাদি করতে অনিল চন্দ আগেই চলে যান, সুরেন কর মশাইও আসেন একটু পরে। তখন বাংলা দেশে সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ চলছে।

সিংহলে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি গল্প লেখেন। এই গল্পই চার অধ্যায় উপন্যাসের ভিত্তি। পানাডুরা বলে একটা জায়গায় থাকাকালে,—সম্ভবত মে মাসের ১৫ই—শান্তিনিকেতনের বিশেষ বন্ধু উইলমট পেরেরা-র বাড়িতে একদিন রাত্রে তিনি গল্পটা পড়ে শোনান। নন্দলাল বসু, সুরেন কর, প্রতিমা দেবী, মীরা দেবী, রানী চন্দ ও অনিল চন্দ শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন। গল্পটা শুনে নন্দলাল বলেন, আর একটু বড় করে লেখা দরকার। বিষয়টা আরও বিস্তারিতভাবে ফুটিয়ে তুললেও ভাল হয়।

রবীন্দ্রনাথ তখন বলেন—'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

আবার লেখা শুরু হল। গেরুয়া রঙের বিশ্বভারতীর খাতাতে। রবীন্দ্রনাথ তখন সব সময় ঐ গল্প নিয়েই মেতে থাকতেন।

কলম্বোতে শান্তিনিকেতনের দলের অভিনয় শেষ হয়ে যাবার পর সবাই বেরোলেন বেড়াতে। রবীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী ও অনিল চন্দ পেরাডেনিয়ায় 'সিলোন টাইম্‌স্‌' নামক খবরের কাগজের মালিক মিস্টার ডি আর বিজয়বর্ধনের অতিথি হন। সেখানে তাঁরা ছিলেন দিন সাতেক। অনিল চন্দ এই প্রসঙ্গে বলেন—"এখানে লেখার ব্যাপারে গুরুদেবের বোধহয় কোন অসুবিধে হচ্ছিল। কারণ ক'দিন ওঁর মেজাজ মোটেই ভাল ছিল না। বৌঠান (প্রতিমা দেবী) আর আমি শঙ্কিত হয়ে আছি, কে জানে কখন কোন কারণে আমাদের উপর আবার রাগ করে বসেন। আমাদের সঙ্গে প্রায় কথাই

বলছিলেন না। পরে জানতে পারলাম, সেই বই লেখার তাগিদই তাঁকে এ রকম করে রেখেছিল। গুরুদেব অনেক অনুরোধে শেষে একদিন মাত্র বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। তাছাড়া লেখার ঘর ছেড়ে কখনও বেরোননি।"

পেরাডেনিয়া থেকে রবীন্দ্রনাথ সদলে এলেন জাফনা। তখন জুন মাসের মাঝামাঝি। সেখান থেকে তিনি আর অনিলকুমার চন্দ মোটরে করে তালাইমান্নারে এসে জাহাজ ধরেন। আসবার পথে একটা রেস্ট হাউসে দুপুরবেলা খাবার পর রবীন্দ্রনাথ বইয়ের শেষ কটা লাইন লেখেন। এই হল সেই ছোট গল্পের দ্বিতীয় রূপ।

এই দ্বিতীয় রূপের পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে কমাস পর একদিন অনিলকুমার চন্দের হাতে দিয়ে দেন।

শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ আবার পাণ্ডুলিপির কিছু অদলবদল করেন। বইয়ের আকারে 'চার অধ্যায়' নাম নিয়ে যা ছাপা হয়, তা হচ্ছে মূল কাহিনীর তৃতীয় রূপ।

সেই সময় বাংলাদেশে দমননীতি সাংঘাতিক রূপ ধারণ করেছিল। বিশ্বভারতীর একজন সুহৃদ—সম্ভবত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য—প্রশ্ন তোলেন: সিডিশন আইনের আওতায় এ বই পড়তে পারে এবং তার ফলে বিশ্বভারতী ছাপাখানা সরকার বাজেয়াপ্ত করতে পারেন।

এই প্রশ্নে বিশ্বভারতীর কর্তাব্যক্তিদের দুশ্চিন্তা হয়। চারুচন্দ্র দত্ত তখন বিশ্বভারতীর অন্যতম কর্তৃপক্ষ। তাঁর অভিমত নেওয়া হল। তিনি বললেন. সাধারণ আইনের কথা আলাদা। কিন্তু বিশেষ অর্ডিন্যান্স ইত্যাদির বলে এ বই প্রকাশ করলে প্রকাশক ও মুদ্রাকরের উপর দমন আইন প্রযুক্ত হতে পারে।

এদিকে রবীন্দ্রনাথ অধৈর্য হয়ে পড়েছেন বইটি প্রকাশ করার জন্যে। প্রতিদিন তাগাদা দেন সবাইকে।

শেষমেষ ঠিক হল, ইংরেজী অনুবাদ তৈরী করে রাখা হবে। আর অনুবাদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মূল বই ছাপা হবে না। অনুবাদ

বিলেতে এলমহার্স্ট সাহেবের কাছে থাকবে। যদি বাংলা বই বাজেয়াপ্ত হয় তবে বিলেতে অনুবাদ প্রকাশিত হবে।

অনিলকুমার চন্দের বক্তব্যে আরও জানা যায়, অনুবাদের ভার দেওয়া হয় সুরেন ঠাকুর মশাইয়ের উপর। খুব সম্ভব ১৯৩৫ সনে চন্দননগরে বোটে থাকার সময় অনুবাদের পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছিল এবং এই কারণেই বই লেখা শেষ হবার বেশ কিছুদিন পর তা ছেপে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের তারিখ ঐ বছরের খৃস্টমাস সপ্তাহ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেছেন, "অপূর্বকুমার অপ্রত্যাশিতভাবে ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন।" পাণ্ডুলিপি কখনও হারিয়ে যায় নি। তাই আবিষ্কারের প্রশ্নও ওঠে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্য উল্লেখ করা দরকার। চার অধ্যায় সেকালে কি রকম উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল তার পরিচয় তাতে কিছুটা পাওয়া যাবে।

১৯৩৬ সনে জওহরলাল নেহরু শান্তিনিকেতনে বেড়াতে আসেন। রবীন্দ্রনাথ তখন সাময়িকভাবে শ্রীনিকেতনে তেতলার ঘরে আছেন। জওহরলাল আর অনিল চন্দ পাশেই এক বাড়িতে একসঙ্গে ছিলেন। এই বাড়িতে থাকতেন মার্কিন ডাক্তার হ্যারি টিম্‌বার্স।

রাত্রে শুতে যাবার আগে জওহরলাল অনিলকুমার চন্দকে বললেন,—কলকাতার একজন বড় নেতার কাছে দুটো কথা শুনে তাঁর মনে বড় ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে! প্রথমত কোন একজন নামকরা স্বদেশীয় সাংবাদিক নাকি ইংরেজ বণিক সমাজের নেতা বেন্‌থালকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাঁদের কাগজে সরকারী নীতির সমর্থন করা হবে। দ্বিতীয়ত ঐ নেতার বাড়িতেই জওহরলাল শুনেছেন—একজন বাঙালী আই-সি-এস রাজকর্মচারী স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বড় কর্তাকে নাকি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর (ঐ আই-সি-এস) অনুরোধে সন্ত্রাস-বাদের নিন্দে করে একটা বই লিখেছেন। সেটা নাটকে রূপান্তরিত

উ৮,

হবে। আর সরকারী সাহায্যপুষ্ট ক্লাব, সঙ্ঘ ইত্যাদি সেই নাটক নানা জায়গায় অভিনয় করবে।

জওহরলাল আরও বললেন,—"এই সব কথা নিয়ে কলকাতায় নেতারা উত্তেজিত।"

শ্রী চন্দ তখন জওহরলালকে চার অধ্যায় রচনার আনুপূর্বিক কাহিনী বর্ণনা করেন। শুনে জওহরলাল এই গুজব রটনার জন্যে মর্মান্তিক দুঃখ প্রকাশ করেন।

সঙ্গত কারণেই উপরোক্ত স্বদেশী সাংবাদিক ও বড় নেতার নাম প্রকাশ করলাম না। বিশ্বস্ত অনেকের কাছে শুনেছি যে সেই নেতার াড়িতে 'চার অধ্যায়' রচনার পিছনে সরকারী প্ররোচনার কথা খন আলোচনা করা হচ্ছিল, তখন কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র ট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন—"আমি বিশ্বাস করি না, বীন্দ্রনাথ সরকারের ইঙ্গিতে বই লিখবেন। আর এ রকম সন্দেহ পাষণ করে আলোচনা করতে বসাও পাপ।"

এই বলে তিনি নাকি উঠে চলে যান।

বাঙালী আই-সি-এস রাজ কর্মচারীর নামও অপ্রকাশ থাক্। তনি এখন বিদেশে এক দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। শুধু এইটুকু লা যেতে পারে যে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত রিচয় প্রথম হয় চার অধ্যায় রচনার বছর পাঁচেক পরে,—মেদিনীপুরে ক অনুষ্ঠানে—তার আগে চাক্ষুষ দেখা পর্যন্ত হয়নি। তবে তাঁর ী শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ছিলেন।

চার অধ্যায় প্রসঙ্গে আরও দু চারটি কথা বলা দরকার। প্রথম ংস্করণের ভূমিকায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পর্কে যে উল্লেখ ছিল, াতে অনেকে বলেন, ব্রহ্মবান্ধবকে অপমান করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ রের সংস্করণে তা বাদ দেন।

তবে শুনেছি তাঁর নিত্য সহচর অনেককে পরেও অনেকবার লেছিলেন, 'ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে আমার ঐ সাক্ষাতের কথা ছবির

মত স্পষ্ট মনে আছে।'

কোন কোন পত্রিকায় আবার বলা হয় স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দের একখানি বইয়ের ছায়া অবলম্বনে চার অধ্যায় রচিত। বলাই বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ ঐ বই চোখেও দেখেননি।

'হাম্ চু পাম্ হাফ্'

খসে-পড়া দেয়াল আর ভেঙে-পড়া ছাদ দিয়ে ঘেরা ঠনঠনে এলাকার একটি পোড়ো বাড়ী। ইতস্তত ছড়ানো ইটের স্তূপ, আবর্জনা। একটু ভেতরে, ডান পাশেই ছোট একটি ঘর। আসবাবের মধ্যে ভাঙা নড়বড়ে ছোট টেবিল এবং চেয়ার নামধারী কয়েকখানি কাঠের জোড়াতালি। আস্তে আস্তে নড়ছে ছোট টানা-পাখা। চারধারে পিন-পড়া নীরবতা। হঠাৎ, হঠাৎ সেই নীরবতার বুক চিরে চামচিকের উড়ো ঝাপটা।

ভাঙা টেবিলের উপর লাল রেশমে জড়ানো বেদমন্ত্রের জীর্ণ পুঁথি; টেবিলের দু'পাশে মড়ার খুলি। সেই খুলির চোখের কোটরে জ্বলছে বৃহদাকার দুটি মোমবাতি।

লালচেলি পরা এক ব্যক্তিকে ঘিরে বসে আছে কয়েকজন; —সকলের চোখেমুখে কৌতূহল, বিস্ময়। তারপর সমস্ত বাড়িঘর কাঁপিয়ে, ভাঙা দেয়ালের দাঁত-বের করা অট্টহাসি ছাপিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হল সংগীতের সুর—"সংগচ্ছধ্বং সং বদধ্বং"—। সভাপতি বললেন—"সভার কাজ আরম্ভ হোক ;—হামচু পাম্ হাফ"—।

অর্থাৎ?—একি কোন তিব্বতী বীজমন্ত্র বা চীন দেশীয় কোন সরাইখানার নাম? কিংবা মহেঞ্জোদাড়ো যুগের প্রাচীন শিলালিপির কোন শব্দ? আর এই ভাঙা পোড়ো বাড়ীতে বসে আছেনই বা কারা?

আসলে কিছুই নয়, এ হচ্ছে একটি সাংকেতিক ভাষা; 'ডিসাইফার' করলে যার মানে দাঁড়ায় 'সঞ্জীবনী সভা'। যে সভার সদস্য বিখ্যাত কয়েকজন মনীষী,—যাঁদের উদ্দেশ্য 'জনহিতকর মহৎ কাজের' ভার নেওয়া।

এই সাংকেতিক ভাষার রহস্য উদ্ঘাটনও তেমন কঠিন নয়; শুধু ভাষাতত্ত্বের একটু ওলটপালট করা মারপ্যাঁচ।

রূপান্তরের ফরমুলাটা হচ্ছে এই ঃ—

অ—আ, আ—অ, ই—উ, ঈ—ঊ, উ—ই, ঊ—ঈ, এ—ঐ, ও—ঔ, ঔ—ও। এবার ব্যঞ্জন বর্ণে আসা যাক।

ক খ গ ঘ—গ ঘ ক খ; চ ছ জ ঝ—জ ঝ চ ছ; ট ঠ ড ঢ—ড ঢ ট ঠ; ত থ দ ধ—দ ধ ত থ; প ফ ব ভ—ব ভ প ফ; শ স ষ হ; হ—স; র—ল্‌; ল-র; ম—ন; ন—ম।

এই ফরমুলাটা মেনে চললেই দেখা যাবে "সঞ্জীবনী সভা" শব্দটি দাঁড়িয়ে গেছে "হামচূ পামূ হাফ" শব্দ। এই ফরমুলায় নিজের নামটা কি দাঁড়ায় তাও এই সঙ্গে চেষ্টা করে দেখতে পারেন, আর গোপনীয়তা রক্ষা করার ইচ্ছে বা দরকার থাকলে এই ভাষায় কথাবার্তা চালাতে পারেন, চিঠিও লিখতে পারেন।

সহজেই অনুমান করা যেতে পারে, 'হামচূ পামূ হাফের' যাঁরা সভ্য, তাঁদের মাথায় অল্পবিস্তর 'ছিট' আছে; আর মহাপুরুষ ব্যক্তি ছাড়া কার মাথায়ইবা 'ছিট' থাকতে পারে। সভার উদ্যোক্তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সভাপতি রাজনারায়ণ বসু এবং সভ্যদের মধ্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও আরো জনকয়েক মান্যগণ্য ব্যক্তি।

সাহিত্যে, সংগীতে ও শিল্পকলায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিভা আলোচনার স্থান এ নয়। তাহলে গোটা ঠাকুর বাড়ীর বহু-আলোচিত ইতিহাসটা নিয়ে আবার নাড়াচাড়া করতে হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সারাজীবন একটা না একটা সভা-সমিতি নিয়ে মেতে থাকতেন। একটা ভাঙেন তো আরেকটা গড়েন। সভা-গুলিও বিচিত্র ধরণের। ছোটবেলার 'ফ্রি ম্যাসন ক্লাব' থেকে সুরু করে 'কমিটি অব ফাইভ' (যার সদস্য ছিলেন কৃষ্ণবিহারী সেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় চৌধুরী এবং যদুনাথ মুখোপাধ্যায়), 'ঈটিং ক্লাব', বিদ্বজ্জন সমাগম, কলিকাতা

সারস্বত সম্মেলন, ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ প্রভৃতি অনেক সমিতি তিনি গড়েছিলেন; যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য ও সংগীতের উৎকর্ষ সাধন। আবার খেয়াল-খুশী মেটানোর বন্দোবস্তও ছিল; নয়ত ঘটা করে 'ঈটিং ক্লাব' খোলার কোন মানে হয় না।

তার মধ্যে 'সঞ্জীবনী সভা' অর্থাৎ 'হামচু পামু হাফ' সবচেয়ে চমকপ্রদ। এই সভার আসল কথা ছিল মন্ত্রগুপ্তি। নিয়ম ছিল —এ সভায় যা বলা হবে, শোনা হবে, করা হবে—কারো কাছে প্রকাশ করা চলবে না। ঠনঠনের সেই পোড়ো বাড়ীতে ছিল সভার আড্ডা। সভায় মড়ার খুলিতে যে মোমবাতি জ্বলতো, তারও অর্থ ছিল। মড়ার মাথাটা মৃত ভারতের সাংকেতিক চিহ্ন। আর বাতি দুটো জ্বালানোর অর্থ মৃত ভারতের জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়ে তোলা। 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং' গান দিয়ে সভার কাজ সুরু হত। সভার কাজ মানেই গল্পগুজব। গোটা কার্যবিবরণী লেখা হত নবউদ্ভাবিত সাংকেতিক ভাষায়। লিখতেন উদ্যোক্তা, আবিষ্কর্তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বয়ং।

এই সভায় নিত্যনূতন প্রস্তাব—তা যত উদ্ভটই হোক—সানন্দে গৃহীত হত। কিন্তু প্রস্তাবগুলি কার্যে পরিণত করার দিকে কারো তেমন নজর ছিল না। অবশ্য দু-একটা প্রস্তাব কার্যকর করার চেষ্টা যে হয়নি এমন নয়। এই সভাতেই গৃহীত হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সার্বজনীন পোশাক তৈরীর প্রস্তাব—সেলাই করা মালকোঁচমারা ধুতির মত পাজামা এবং শোলার টুপির উপর পাগড়ি বসানো শিরস্ত্রাণ। এই কিম্ভূতকিমাকার পোশাক পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সারা কলকাতা বেড়িয়ে আসেন। এই ঘটনা নিয়েই রবীন্দ্রনাথ 'জীবন স্মৃতিতে' লিখেছেন—

"দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে, এমন লোকের অভাব নাই; কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সার্বজনীন পোশাক পরিয়া, গাড়ী করিয়া কলিকাতায় রাস্তা দিয়া, যাইতে পারে এমন লোক

নিশ্চয়ই বিরল।"—

সঞ্জীবনী সভায় গৃহীত আরো দুটি প্রস্তাবের কথা বলি। সভ্যেরা যখন দেখলেন, এমন সুন্দর আন্তর্জাতিক পোশাক কেউ গ্রহণ করল না, তখন নজর দিলেন শিল্প-বাণিজ্যের কল প্রতিষ্ঠার দিকে। প্রথমে তৈরী হল দেশলাইয়ের কল। অনেক পরিশ্রমে ও বহু অর্থব্যয়ে যে দেশলাই কাঠি তৈরী হল, তাতে দেখা গেল আগুন ধরানো ছাড়া দাঁত খোটা ম্যাজিক দেখানো যে কোন কাজই চলতে পারে। শেষ পর্যন্ত যখন একই প্রতিষ্ঠান যুগপৎ প্রস্তুতকারক ও ক্রেতা হয়ে পড়ল, তখন দেশলাইয়ের কল ছেড়ে উৎসাহে বসানো হল কাপড়ের কল। ঠিক হল, বিরাট বাড়ি হবে, হাজার হাজার তাঁত বসবে, শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুরু হবে নতুন অধ্যায়। উৎসাহের প্রাচুর্যে প্রথমেই নবপ্রতিষ্ঠিত কাপড়ের কল থেকে তৈরী হয়ে বেরোল একখানি গামছা। সে এক স্মরণীয় দিন। আড়ম্বরে, ভোজে, আনন্দোৎসবে সেদিন সভায় একেবারে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড।

কিন্তু ঐ একখানা গামছাতেই কাপড়ের কলের উৎপাদনের পরিসমাপ্তি ঘটে। হয়তো বা সঞ্জীবনী সভারও—না, না, "হামচূ পামূ হাফের।"

শবদে শবদে বিয়া—

মোটর আর হোটেল মিলে যদি ইংরেজীতে 'মোটেল' হয়, স্মোক আর ফগ মিলে হয় 'স্মোগ', তবে বাংলা ভাষাতে 'গম্ভীরু' হবে না কেন? যে-ভদ্রলোক দেখতে-শুনতে বেশ গম্ভীর এবং স্বভাবের দিক থেকে ভীষণ ভীরু তাঁকে 'গম্ভীরু' ছাড়া আর কী বলব?

তেমনি 'স্কন্ধকাটা অন্ধকার'কে নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে 'স্কন্ধকার।' বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবার কারণ নেই।

উদাহরণ আরও আছে। তাজমহলকে কী বলব? বলব, প্রেমের একটি মেমোরিয়েল। সুতরাং তাজমহলের নাম যদি দিই "প্রেমোরিয়েল" আপত্তির কিছু আছে? থাকা অন্তত উচিত নয়। যে পেটুক প্লেটের পর প্লেট খাবার সাবাড় করে তাকে "প্লেটুক" বলার অধিকার কি আমার নেই?

এখন যদি বলি, রামবাবু ভীষণ 'গম্ভীরু' লোক, সেদিন 'স্কন্ধকারে' আগ্রার 'প্রেমোরিয়েল' তাজমহলের কোণায় বসে আস্ত 'প্লেটুকে'র মত গব-গব করে খাবার গিলছিলেন—তাহলে বৈয়াকরণের দলও আমায় গিলে খাবেন। কিন্তু ভাষাসৃষ্টির প্রধানতম উদ্দেশ্যের, অর্থাৎ ভাব বিনিময়ের, কোন ক্ষতি হবে কি? আশা করি, না।

এবং যদি না হয়, তাহলে বলব, এদিক দিয়ে বাংলা ভাষায় নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টির অবকাশ অপরিমিত। জোড়া শব্দের আদি-অন্তে সমার্থক ধ্বনির যুগলমিলন ঘটিয়ে ভাষার জাদু সৃষ্টি করা এই বাংলা ভাষাতে কঠিন কাজ নয়।

সুকুমার রায় উদ্ভট রস সৃষ্টিতে আমাদের 'হাতিমি' এবং 'হাসজাঁরু'র সন্ধান দিয়েছিলেন, তিনি বাংলা ব্যাকরণ মানেননি।

রবীন্দ্রনাথ বাচস্পতি মশায়ের জবানিতে এই বাংলা ভাষাতেই লিখেছেন—"সম্মমরাট সমুদ্রগুপ্তের ক্রেংকটাকৃষ্ণ ত্বরিৎ ত্রম্যস্ত পর্যুগাসন উত্থংসিত নিরংকরালের সহিত অজাতশত্রু অপরিপর্যম্মিত গর্গরায়নকে পরমন্তি শয়নে সমুসদ্‌গারিত করিয়াছিল।" সম্মমরাট, উত্থংসিত, পরমন্তিশয়ন প্রভৃতি শব্দ উদ্ভট রসের জোগান দিলেও অর্থদ্যোতক, ইংগিতবাহী। রাজার রাজা যেমন মহারাজা তেমনি সম্রাটের সম্রাট 'সম্মমরাট'। 'গল্পসল্পের' এই বাচস্পতির মুখে আমরা শুনেছি চংচটকা, তাঞ্ঝিম মাঙঝিম প্রভৃতি অনেক চটকদার শব্দ। চম্পট না বলে চংচটকা বলতে আপত্তি কি? মাথা বেশী ঝিমঝিম করলেই তাঞ্ঝিম মাজঝিম করার কথা বলা চলে। 'জঙ্গম' উপন্যাসে বনফুলের ভনটুও বহু নতুন শব্দ আমাদের সামনে হাজির করেছে। তার মধ্যে 'লদকালদকি' শব্দটি তো পাড়ার ছেলেদের মুখে অনেকদিন চালু। ইংরেজী সাহিত্যে জেমস জয়েস বহু নতুন শব্দ সৃষ্টির কৃতিত্বে যশ কিনেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে শেলী, স্কট, শেক্সপীয়ার থাকতে পারেন, জেমস জয়েসই বা থাকবেন না কেন?

মোট কথা, বাংলা ভাষায় শব্দের ভাণ্ডার আরও বাড়াবার সময় এসেছে। এদিক দিয়ে আমরা অবশ্য যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী। ইংরেজী, ফার্সী, আরবী, গ্রীক, ওলন্দাজ, ফরাসী, পর্তুগীজ, চীনে কোন ভাষাই বাদ দিইনি। বিদেশী শব্দের পরিধি দিন দিন বাড়ছে। স্বাধীনতা লাভের পরেও গ্রামে-গ্রামে চালু হয়েছে ক্যানাল, কিউ, রেশন, জীপ, কলোনী, রিফিউজী, এসেম্বলী, গ্যালারি, স্টেডিয়াম, এমনকি এটেস্টেশনের মত কঠিন শব্দও। রাজ্যের ভূমি সংস্কারের দৌলতেই এসেছে 'এটেস্টেশন'। জনপদ বিশেষে তার উচ্চারণ যদিও পৃথক পৃথক। কোথাও 'এটেশ্বন', কোথাও 'এটেশান।' দেশ বিভাগের দৌলতে এসেছে কলোনী, রিফিউজী। কম্যুনিটি প্রজেক্ট দিয়েছে জীপ। যুদ্ধ কিউ, রেশন। পঞ্চবার্ষিক যোজনা দিয়েছে ক্যানাল।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়, আরও শব্দ দরকার আমাদের ভাষায়। শুধু আমদানি দিয়ে নয়, ধ্বনির হেরফেরে নিজের ভাষা থেকেই শব্দের নতুন দিগন্ত খুলে দিতে হবে। প্রয়োজনের খাতিরেই দৈনিক সংবাদপত্র 'আনন্দবাজার' যেমন চালু করেছে 'পরিস্থিতি', বাংলা 'রস' আর পর্তুগীজ 'আনানাস' মিলে হয়েছে আনারস, তেমনি ঐশ্বর্য বৃদ্ধির খাতিরে বানাতে হবে ধ্বনি-সন্ধির নতুন শব্দ, ক্রিয়াপদকে করতে হবে আরও গতিশীল। অনুকার অব্যয় আর ধ্বন্যাত্মক শব্দে বাংলা ভাষা যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তেমনি সে বিকলাঙ্গ ক্রিয়াপদের বেলায়। ছমছম অন্ধকারে ঝমঝম বৃষ্টি, মিশমিশে কালো ছিপছিপে মেয়ের গুণগুণ গান প্রভৃতি ইংগিতবাহী ধ্বনিমধুর বাক্য রচনা একমাত্র বাংলাতেই বুঝি সম্ভব। কিন্তু ক্রিয়াপদ? 'কৃ' আর 'ভূ' ধাতুর একাধিপত্যে বাক্যের বারোটা বেজে যায়। সেদিক দিয়ে ইংরেজীর তুলনা নেই। নাউন তো নাউন, প্রোপার নাউনকে পর্যন্ত ক্রিয়াপদে-বেঁধে ফেলার কায়দা ইংরেজী ভাষা জানে। বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদের দুর্বলতা ঢাকার জন্যে "রোদেচ্ছে", (রোদ হচ্ছে) "বিষ্টোচ্ছে" (বিষ্টি হচ্ছে) "জলাচ্ছে" (জল ছড়াচ্ছে) প্রভৃতি শব্দ কি তৈরী করা যায় না? প্রথম প্রথম শুনতে বিশ্রী লাগবে ঠিকই; কিন্তু কোন ভাষাবিদের হাতে পড়ে বাংলা ক্রিয়াপদের রূপান্তর ঘটা তেমন কিছু অসম্ভব নয়। আরও অসম্ভব নয় 'প্লেটুকের' মত ধ্বনি-সন্ধির নতুন শব্দ সৃষ্টি করা। 'স্মোগ' অনুকরণে তৈরি করেছিলাম 'ধোঁয়াশা।' আনন্দবাজার পত্রিকা মারফৎ সেটা এখন চালু হয়ে গেছে সারা বাংলা দেশে।

মালাকার রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ নিজেই একটি গানে বলেছেন ঃ

"ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লাগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।"

প্রকৃতি তার বিপুল সম্ভার নিয়ে কবির সামনে দাঁড়িয়েছে। সেই 'আনন্দের দান'কে তিনি নানারূপে নানাভাবে সাহিত্যের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। নীল আকাশের আলোর ধারা আকণ্ঠ পান করে প্রকৃতির রূপসাগরে সারা জীবন ডুব দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের কথা বাদই দিলাম। তাঁর কাব্যে, বিশেষত সংগীতে, প্রকৃতির জয়গানই যেন প্রধান। ঋতু-সংগীত তো বটেই, পূজা এবং প্রেমের গানেও বর্ণে-গন্ধে সমুজ্জ্বল প্রকৃতি ছড়িয়ে আছে। ফুল প্রকৃতির একটি প্রধান উপাচার। কী কী ফুল তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে জানার কৌতূহল অনেক সময় হয়। কোন পরিশ্রমী গবেষক যদি রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে ফুলের একটি তালিকা উদ্ধার করে দিতে পারেন তা হলে বড় ভাল হয়।

রবীন্দ্রনাথ তার ঋতু-সংগীতগুলিতে কী কী ফুলের উল্লেখ কতবার করেছেন, তার একটি তালিকা আমি তুলে ধরছি। আগেই বলেছি, পূজা এবং প্রেমের গানেও প্রকৃতির—সঙ্গে সঙ্গে ফুলের বর্ণনা আছে। এমন কি, এমন কয়েকটি ফুলের কথা আছে যা ঋতু-সংগীতেও নেই। তবে ঋতু-সংগীতের ফুলের উল্লেখ সর্বাধিক বলে কেবলমাত্র ঋতু-সংগীতের ফুলের তালিকা পেশ করে রবীন্দ্রনাথের

একটা দিকের পরিচয় দিতে চেষ্টা করছি। এই ফুলগুলি থেকেই রবীন্দ্রনাথের মেজাজের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার দাপটে ইদানীং আমরা যেন প্রকৃতি-পরিচয়ের পাঠ নিতে ভুলে যাচ্ছি। ফুল বা গাছপালার সঙ্গে পরিচয় শুধু পুস্তকাদির গণ্ডীতেই আটকা পড়ে আছে। গোলাপ, রজনীগন্ধা এবং কয়েকটি বিলিতি ফুল ছাড়া অন্যান্য কারও সঙ্গে নিবিড় পরিচয় নেই। চাক্ষুষ পরিচয় না থাকায় বহু বর্ণিত এবং বহুপঠিত ফুল গড়গড় মুখস্থ বলে যেতে পারি, চিনতে পারি না। মল্লিকা ও বেলি যে একই ফুল, মালতী ও চামেলী যে একই তা কি আজকালকার সব ছেলেমেয়ে জানে? কিংবা তাদের গুরুজনরাও কি জানেন?

ফুল সম্পর্কে নিবিড় পরিচয় না থাকায় তাই রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং রবীন্দ্র-সংগীতের রসাস্বাদনে ব্যাঘাত জন্মায়। এমন কি, যাঁরা রবীন্দ্র-সংগীত গেয়ে থাকেন, তাঁদের অনেকের ফুল সম্পর্কে অজ্ঞতা গানের মেজাজ ফুটিয়ে তুলতে বাধার সৃষ্টি করে।

ইদানীংকার গীতিকারদের অজ্ঞতার একটি উদাহরণ দিই। একটি জনপ্রিয় বাংলা আধুনিক গানের দুইটি কলি হচ্ছে—

"কাজল কাজল কুমকুম,
শিউলি পড়ে ঝুমঝুম।"

বোধহয় শিউলী ফুল প্ল্যাস্টিকের তৈরী। নয়তো এত ঝুমঝুম শব্দ হবে কেন?

তা ছাড়া আমার ধারণা রবীন্দ্রনাথের গান যাঁরা গেয়ে থাকেন, তাঁদের সকলের প্র্যাক্টিক্যাল ট্রেনিং-এর জন্য কিছুদিন শান্তিনিকেতন থাকা দরকার। গোটা শান্তিনিকেতনই যেন রবীন্দ্র-সংগীতের বাস্তব রূপায়ণ।

"শালের বনে থেকে থেকে
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে

জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে,

মাঠের পারে।'

কিংবা

"নীল দিগন্তে ঐ ফুলের

আগুন লাগল,

বসন্তে সৌরভের শিখা জাগল।"

এই সকল পংক্তি শান্তিনিকেতন ছাড়া আর কোথায় এমন সুশৃঙ্খল-ভাবে চোখের সামনে সাজানো?

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের মধ্যে প্রত্যেক শ্রোতাকে শিশুর মত হাত ধরে ধরে প্রকৃতি-পরিচয়ের পাঠ দিয়েছেন, ফুলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন—

"তুমি কে গো?"—আমি বকুল।"

"তোমরা কে গো?"—আমরা পারুল।"

তা ছাড়া ফুলের ভাষা ও কবির ভাষা এক জায়গায় এসে মিশে গিয়েছে, তারা ঘরের লোকের মত আপন হয়ে গিয়েছে।

"ফুলগুলি ঐ মুখে চেয়ে

কী কথা কয় মনে মনে।"

নিতান্ত আপন জন না হলে ফুলের সঙ্গে "তুই তোকারি'-ই বা চলে কী করে? "ও চাঁপা, ও করবী, কারে তুই দেখতে পেলি আকাশ মাঝে?"

রবীন্দ্রনাথের প্রায় তিন শত ঋতু-সংগীতে কী কী ফুল কতবার ব্যবহৃত হয়েছে তার একটি তালিকা দেওয়া হল। তাল, তমাল, পিয়াল, ধান, অশ্বথ, জাম ইত্যাদির উল্লেখ বহুবার থাকা সত্ত্বেও ঐগুলি নীচের তালিকা থেকে বাদ দিলাম। তবে আম ও শালের মঞ্জরীকে রেখেছি।

বকুল (২৫ বার) নীপ কদম্ব কদম (২০) মালতী চামেলি (১৮) শিউলি শেফালি শেফালিকা (১৭) পলাশ কিংশুক (১৩)

মাধবী (১১) মল্লিকা (১০) চাঁপা (১০) যূথী জুঁই (১০) শিরীষ (৭) আমের মঞ্জুরী (৭) কেতকী কেয়া (৭) অশোক (৭) করবী (৫) কাশফুল (৫) পারুল (৫) কুন্দ (৩) পদ্ম (৩) রজনীগন্ধা (২) জবা (২) কৃষ্ণচূড়া (২) ঝুমকোলতা (২)। দোলন চাঁপা, শ্বেত করবী, শ্বেতপদ্ম, মেঠোফুল, বনফুল, সরষে ফুল, কামিনী শিমুল, কাঞ্চন, রঙ্গনগোলাপ, পারিজাত একবার করে উল্লিখিত।

বকুল ফুলের উল্লেখ আছে প্রায় সব ঋতুতেই। মালতীর উল্লেখ বর্ষা বসন্ত শরতে। বর্ষায় কদম্ব, শরতে শিউলি এবং বসন্তে পলাশেরই প্রাধান্য।

আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গানে কদমফুলের ছড়াছড়ি থাকা সত্ত্বেও 'কদম্বকুঞ্জের সুগন্ধ মদিরা' তাঁকে পাগল করে তুললেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কদমফুলকে ততটা ভালবাসতেন না বলেই জানা যায়। শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত 'ঋতুপত্র' নামক পত্রিকার হেমন্ত সংখ্যা থেকে রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠির কিয়দংশ তুলে ধরছি। এই চিঠিতে ফুল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। "বাগানে বিশেষ করে মন দিস। কাছাকাছি গোটা দুই তিন চামেলির ঝোপ লাগিয়ে চামেলিয়া নাম সার্থক করতে হবে। আমি বড় গাছ ভালবাসি, কিন্তু বাড়ির খুব কাছে নয়। সজনে গাছের কথা মনে রাখিস। শীতের সময় ফুল ধরায়, অথচ বাড়তে সময় নেয় না। মহানিম, শিমুল ওখানকার মাটিতে ধরে সহজে। পালতে মাদারের বেড়ায় কাঁটা এবং ফুল দুই পাওয়া যায়, বন জুঁইয়ের বেড়া ও উত্তম। রক্তকরবী গরুতে খায় না, তার ফুলের গৌরব ও আছে, সাদা করবী লাল করবী দুই পাশাপাশি চলবে। নেবুফুলের গন্ধ আমার প্রিয়, তার ব্যবস্থা রাখিস। ফুলের ঐশ্বর্য আছে চালতা গাছে—শিরীষ, জামরুল, গোলাপ-জামকে আমি ফুলের জন্যে পছন্দ করি। মহাদেব ছুটি নিলে তার জায়গায় পরিশ্রমী সাঁওতাল মালি রাখিস। সারা জষ্টি

মাস জল লাগবে। কোন একটা লাইন কেটে পর্যায়ক্রমে কুরচি ও কাঞ্চন লাগানো যেতে পারে। দু-চারটে গন্ধরাজ লাগালে দোষ নেই। যে গাছ ভালবাসিনে সে হচ্ছে ছাতিম কদম্ব। আমার ও জায়গাটাতে শিরীষ কেন জোর পায় না খবর নিস।"

যে ছাতিম গাছ নিয়ে শান্তিনিকেতনের গোড়াপত্তন, যার তলায় তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধ্যানের আসন পেতেছিলেন, তাকেই রবীন্দ্রনাথের অপছন্দ? আশ্চর্য!

বইয়ের নাম

শেক্সপীয়ার যাই বলুন, নামের মাহাত্ম্য অনেক। ‘পহেলা দর্শন-ধারীর’ সঙ্গে বাহারী নাম জুটলে কদর বেড়ে যায়। মানুষের বেলায় তো বটেই, বইয়ের বেলায়ও। আজকাল তাই বাংলা বইয়ে প্রচ্ছদপটের যেমন বাহার, তেমনি বাহার নামের।

বই লেখার প্রথম সমস্যা নামকরণের। আমি এক নামকরা লেখককে জানি, জুৎসই নাম না পাওয়ার জন্যেই তাঁর অনেক বই লেখা হয়নি। অধিকাংশ লেখকই বইয়ের নামকরণের বেলায় যত্নবান। কেউ লেখার শুরুতেই নাম ঠিক করে রাখেন, কেউ ঠিক করেন লেখার শেষে। দু' একজন উদাসীন ছাড়া প্রায় সকলেই নাম পালটে পালটে বহুর থেকে একের সন্ধান পান।

বইয়ের নামকরণে সংকেত ও অভিনবত্বের আরোপ এ যুগের দান। বিষয়বস্তু যা-ই হোক, নামের বাহারে প্রায় সকল বাংলা বই-ই যে কোন ভাষার সাহিত্যকে টেক্কা দিতে পারে। অভিনবত্বের জন্যেই আজকাল বাংলা গল্প উপন্যাস কবিতার বইয়ের নাম আগেকার মত এক বা দুই শব্দে সমাপ্ত নয়, তিন বা চার শব্দের জাদুতে পাঠককে কাবু করার কায়দা এখনকার সাহিত্যিকেরা আয়ত্ত করেছেন।

অথচ কিছুকাল আগেও বাংলা বইয়ের নাম ছিল সাদাসিধে। গোড়ার কথা বাদ দিই—তখন মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য বা অন্যান্য লৌকিক, পৌরাণিক শাখার সাহিত্যের বই ছিল এক এক জাতের মার্কামারা নামের ছাঁচে ঢালাই করা। অন্যান্য দশটা নতুনত্বের মত বইয়ের নামকরণে নতুনত্ব এল উনবিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু তা'ও ছিল বিষয়বস্তু বা নায়ক নায়িকার নাম তুলে ধরে। শুধু উপরি দেওয়া হল রোমান্স বা কাব্যের ছোঁয়াচ।

মেঘনাদ বধ, বৃত্রসংহার, পলাশীর যুদ্ধ, সারদামঙ্গল, পদ্মিনী উপাখ্যান প্রভৃতি নামেই বোঝা যায় বিষয়বস্তুর সঙ্গে নামকরণের একাত্মতা। ঐ সময় শেক্সপীয়ারের যে সকল নাটক বাংলায় অনুবাদ করা হয়, তার নামে অবশ্য অভিনবত্বের ছাপ দেখা যায়। যেমন রোমিও জুলিয়েটের বাংলা অনুবাদ হল চারুমুখ-চিত্তহরা, দি মার্চেণ্ট অব ভেনিস-এর ভানুমতী চিত্তবিলাস।

উপন্যাসের নামকরণে বঙ্কিমচন্দ্র আনলেন কিছুটা নতুনত্ব। তবে বঙ্কিমচন্দ্র ও পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র নায়ক নায়িকার নামেই বেশীর ভাগ বইয়ের নামকরণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ, কপালকুণ্ডলা, সীতারাম প্রভৃতি এবং শরৎচন্দ্রের কাশীনাথ, চন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত, দেবদাস, ইত্যাদি তার উদাহরণ। তবে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক সময় সোজাসুজি নায়ক নায়িকার নাম না দিয়ে রোমান্সের স্পর্শ লাগিয়েছেন। যেমন তিলোত্তমা না দিয়ে তার প্রথম উপন্যাসের নামকরণ করলেন দুর্গেশনন্দিনী। শরৎচন্দ্রের রচনার মত তাঁর বইয়ের নামও সরল, সাধাসিধে।

নামকরণে বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে বেশী নতুনত্ব দেখিয়েছেন রমেশচন্দ্র দত্ত। তাঁর লেখা মাধবীকঙ্কণ, মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত ও রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা এই কথাই প্রমাণ করে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন অজস্র। নামকরণের সুযোগও তাই পেয়েছেন প্রচুর। কবিতার বইয়ের সংখ্যাই তাঁর বেশী ? রবীন্দ্রনাথ বাঙালী কাব্যপাঠককে এক নতুন জগতে নিয়ে এলেন। কাব্যের বিষয়বস্তু বা ভঙ্গীতেই শুধু নয়, নামকরণেও। তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল এক বা দুই শব্দের উপর। এক শব্দের নামে আবার তিনটি অক্ষরের প্রাধান্য। যেমন মানসী, ক্ষণিকা, কণিকা, মহুয়া, বলাকা, পূরবী, কল্পনা, ইত্যাদি। পূর্বসূরীদের কবিতার বইয়ের নামকরণের সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের নামকরণের আকাশ পাতাল তফাৎ। নামের মধ্যে এমন প্রাণের সঞ্চার তাঁর আগে কেউ করতে পারেননি। তাঁর

নাটক বা উপন্যাসের নামকরণেও আছে বৈশিষ্ট্যের ছাপ। অরূপ রতন, অচলায়তন, মুক্তধারা, চোখের বালি, যোগাযোগ, শেষের কবিতা প্রভৃতি নাম তার প্রমাণ। প্রবন্ধ পুস্তকের নামকরণে রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি পূর্বরীতিই বজায় রেখেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল, অক্ষয়কুমার বড়াল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান প্রভৃতি কবিরাও রবীন্দ্র নামকরণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে বাংলা গল্প উপন্যাসে নামের বাহার শুরু। অনেকে রইলেন রবীন্দ্রধারাবাহী. অনেক নিলেন নতুন পথ। নতুন পথের পথিকদের আবার নাম করণের অন্যতম উৎস হল রবীন্দ্রকাব্য। প্রথম গল্পের নামে গল্প সংগ্রহের নামকরণ করারও রেওয়াজও চালু হল। কেউ কেউ আবার শেষ গল্পের নামেও গল্প সংগ্রহের নাম দিতে লাগলেন।

হাল আমলের বাংলা বইয়ের নামকরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, আগেই বলেছি,এক বা দুই শব্দের পরিবর্তে তিন বা চার শব্দে নামকরণের ঝোঁক। তাছাড়া এককালে ভারতচন্দ্রের কবিতার পঙক্তি যেমন প্রবাদে পরিণত হয়েছিল এবং পরবর্তী সাহিত্যিকদের প্রকাশ ভঙ্গীতে স্থান পেয়েছিল, তেমনি রবীন্দ্র পরবর্তী এ যুগের বাংলা সাহিত্যিকদের প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়াল রবীন্দ্রকাব্যের বিভিন্ন পঙক্তি। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যিকদের কতখানি আচ্ছন্ন করে রেখেছেন, তার প্রমাণ মেলে বর্তমান বাংলা বইয়ের নামকরণে। বিশেষত গল্প উপন্যাসে।

বইয়ের নামকরণের জন্য রবীন্দ্রকাব্যে প্রথম হানা দিয়েছিলেন বোধ করি বুদ্ধদেব বসু। গতানুগতিকতার পথ ছেড়ে তিনি বইয়ের নাম দিলেন, আমি চঞ্চল হে, যেদিন ফুটল কমল ইত্যাদি। তারপর ইদানীংকাল পর্যন্ত অজস্র বইয়ের নাম করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতার পঙক্তি থেকে।

কৌতূহলী পাঠকের কাছে তার এক দীর্ঘ তালিকা উপস্থিত করা যেতে পারে। আমার অনুমান, অন্ততপক্ষে তিন-চারশ বাংলা

বইয়ের নামকরণ হয়েছে রবীন্দ্রকাব্যের পঙক্তি দিয়ে। ঐ ধরনের নামকরণ দিন দিন বেড়েই চলেছে।

নামকরণে সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করা হয়েছে মহুয়া কাব্যের পথের বাঁধন কবিতাটি। পথ বেঁধে দিল, বন্ধন হীন গ্রন্থি (এই নামে তিন চারখানা বই আছে), হঠাৎ আলোর ঝলকানি, রডোডেন্‌ড্রোন গুচ্ছ প্রভৃতি নাম 'পথের বাঁধন' কবিতাটিরই পঙক্তি।

কৌতূহলী পাঠকের জন্যে রবীন্দ্রকাব্যের পঙক্তি থেকে তোলা অল্প কয়েকটি বাংলা বইয়ের নাম নীচে দিলাম। এ নামের তালিকা যে সম্পূর্ণ নয়, তা আশাকরি উল্লেখ করার প্রয়োজন রাখে না। লেখকের নাম বাদ দিয়েই বইয়ের নাম দেওয়া হল। এঁদের প্রায় প্রত্যেকেই এ যুগের খ্যাতনামা সাহিত্যিক।

নামগুলি হচ্ছে এই :—বধূ অমিতা, মেঘের পরে মেঘ, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার, তুমি সন্ধ্যার মেঘ, সিন্ধু পারের পাখি, কিনু গোয়ালার গলি, নানা রঙের দিন, মন মানে না, কালের মন্দিরা, প্রথম কদম ফুল, পরম রমণীয়, জনপদ বধূ, আসা যাওয়ার পথের ধারে, অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণ গুরু, যে নদী মরু পথে, একটি নমস্কারে, উদয়ের পথে, বসন্ত জাগ্রত দ্বারে, একদা তুমি প্রিয়ে, ওগো বধূ সুন্দরী, পৌষ ফাগুনের পালা, ঘরেতে ভ্রমর এলো, হে বীর পূর্ণ কর, হে অতীত কথা কও, বকুল গন্ধে বন্যা এল, রাঙামাটির পথ, মনে ছিল আশা, যা বলো তাই বলো, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাছাড়া সোজাসুজি না হলেও নামকরণের সময় অবচেতন মনের ক্রিয়ার অনেক সময় রবীন্দ্রকাব্যের পঙক্তি এসে গেছে। যেমন ধরুন 'কখনো আসেনি' বইটি। আপাতদৃষ্টিতে নামটি 'নির্দোষ' মনে হলেও নামকরণের সময় লেখকের মনে নিশ্চয়ই রোদন ভরা এ বসন্ত, সখি, কখনো আসেনি বুঝি আগে পঙক্তিটি কাজ করেছিল। তেমনি শাল পিয়ালের বন (ওরে বকুল পারুল, ওরে শাল পিয়ালের বন), পলাশের নেশা (কিছু পলাশের নেশা, কিছুবা চাঁপায় মেশা),

বন্দরের কাল (বন্দরের কাল হল শেষ), কত অজানারে (কত অজানারে জানাইলে তুমি) প্রভৃতি বইয়ের নামকরণেও ঐ কথা খাটে। তবে একটা জিনিস লক্ষ্যণীয় যে, গল্প উপন্যাসের তুলনায় কাব্য গ্রন্থে রবীন্দ্রকাব্য পঙক্তির ব্যবহার অনেক অনেক কম।

স্বীকার করি, এ যুগের বাংলা বইয়ের নামকরণে জৌলুস এসেছে, সংকেত এসেছে; কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, বইয়ের বিষয়বস্তুর সঙ্গে নামকরণের তেমন সঙ্গতি নেই, এ যেন শুধু নামের বাহার বাড়ানোর জন্যেই নামকরণ। অনেক সময় 'দুর্বোধ্যতা'ও পাঠককে পীড়া দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আছে চমক সৃষ্টির প্রয়াস। তাই কোন কোন বই 'নামৈব কেবলম', নতুনত্বের বাহারই সার।

আমাদের 'শেক্সপীয়র'

কার্লাইল বলেছিলেন, ভারত-সম্রাজ্য আর শেক্সপীয়ারের মধ্যে ইংরেজ দ্বিতীয়টিকেই বেছে নেবে। কথাটা উল্টো দিক থেকেও সত্য। ভারতবাসী ইংরেজ শাসনকে যদি বা সামান্যই বরদাস্ত করে থাকে, তা হলে শুধু ওই শেক্সপীয়ারেরই জন্যে। শেক্সপীয়ার আমাদের কাছে পাশ্চাত্য জ্ঞান-ভাণ্ডার ও সাহিত্যসম্ভারের প্রতীক। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংরেজী চর্চার প্রথম উচ্ছ্বাস শেক্সপীয়ারের রচনা-বলীর মাধ্যমেই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলকাতা শহরে নাটক-অভিনয় দিয়ে শেক্সপীয়ারের জগতে আমাদের প্রবেশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে তার চরম স্ফূর্তির পর এখনও সেই যাত্রা নিরন্তর প্রবাহিত।

বাংলা দেশে শেক্সপীয়ার-চর্চার যখন শুরু, তখন সংবাদপত্র আসরে আসেনি। তবু নানা চিঠিপত্রে অজস্র উল্লেখ পাই কলকাতার মঞ্চে ম্যাকবেথ, ওথেলো, হ্যামলেট প্রভৃতি নাটক অভিনয়ের। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে খবরের কাগজে রয়েছে এই ধরনের বহু অভিনয়ের বিবরণ। ১৭৮৪ সালের অক্টোবরে ক্যালকাটা থিয়েটারে অভিনীত 'দি মার্চেন্ট অব ভেনিসের' সাফল্যমণ্ডিত অভিনয়ের সাক্ষ্য এখনও বহন করছে 'ক্যালকাটা গেজেট।'. ১৭৮৮ সালে ওই একই প্রেক্ষা-গৃহে অভিনীত হয়েছেন রিচার্ড দি থার্ড এবং গত শতকের গোড়ার দিকে সে যুগের শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয় চৌরঙ্গী থিয়েটারেও শেক্সপীয়ারের বহু নাটক দর্শকের হাততালি কুড়িয়েছে। সে যুগের খবরের কাগজ থেকেই আমরা জানতে পারি মিসেস ডিক্‌ল, মিস কাউলি, স্টোকলার, অরমণ্ড, ক্লডমেন্ট প্রমুখ খ্যাতনামা অভিনেতা অভিনেত্রীর নাম।

এঁরা সবাই বিদেশী এবং দর্শক হিসেবে রস উপভোগ করা ছাড়া স্থানীয় লোকের তেমন কিছু করণীয় ছিল না। ব্যতিক্রম একজন।

১৮৪৮ সালের আগস্ট মাসে একদিন বিজ্ঞাপন বেরোয় 'ওথেলো'র ভূমিকায় অভিনয় করবেন একজন 'নেটিভ এমেচার।'

ডেসডোমিনার ভূমিকায় জনৈকা ইংরেজ-ললনাব নামার কথা ছিল। তাই এই ঘোষণা নিয়ে দারুণ হৈ-চৈ এবং শেষ পর্যন্ত সেদিনের সেই অভিনয় বাতিল করতে হয়। কিন্তু প্রযোজক হতোদ্যম হননি ওই বছরের ১৭ই আগষ্ট আবার ব্যবস্থা হয় ওথেলো অভিনয়ের এবং নাম ভূমিকায় নামেন বৈষ্ণবচরণ আঢ্য। বলা বাহুল্য, এই অভাবনীয় ঘটনায় প্রেক্ষাগৃহ সেদিন ফেটে পড়েছিল।

তবে এ হল শেক্সপীয়ার-চর্চার অন্য দিক, এবং আদি যুগ। আসল চর্চা ততদিনে শুরু হয়ে গিয়েছে হিন্দু কলেজে ইয়ংবেঙ্গলদের মধ্যে। হিন্দু কলেজের শিক্ষায় এই কালজয়ী সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হলেন সাধারণ ছাত্রসমাজ।

এদিক থেকে এদেশে শেক্সপীয়ার চর্চার পথিকৃৎ ডি এল রিচার্ডসন। তিনিই বাঙালীদের মনে শেক্সপীয়ারের রস সঞ্চারিত করেন। মাইকেল ছিলেন রিচার্ডসনের ভক্ত শিষ্য। এই মাইকেলই বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করতেন শেক্সপীয়ারের প্রতিভা নিয়ে। বলতেন, শেক্সপীয়ার ইচ্ছে করলে নিউটন হতে পারতেন, নিউটন কখনও শেক্সপীয়ার হতে পারতেন না। রিচার্ডসনের প্রসঙ্গে স্মরণীয় পার্সিভ্যালের নাম। পরবর্তীকালে এই কৃষ্ণকায় ভদ্রলোকটি শেক্সপীয়ার-অধ্যাপনায় নবযুগের সূচনা করেন।

শুধু ইংরেজিতে শেক্সপীয়ার পড়েই আমরা কিন্তু ক্ষান্ত হইনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তার বাংলা রূপান্তরের দিকে আমাদের নজর পড়ে। এ বিষয়ে সম্ভবত প্রথম বই গুরুদাস হাজরার। ১৮৪৮ সালে শেক্সপীয়ারের প্রথম গদ্য অনুবাদ—'রোমিও এবং জুলিয়েটের মনোহর উপাখ্যান।' দ্বিতীয় গদ্যানুবাদের কৃতিত্ব ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটির। তাঁরা বের করেন 'মহাকবি শেক্ষপীয়র

প্রণীত নাটকের মর্মানুরূপ কতিপয় আখ্যায়িকা।"

এই দিকে উল্লেখ্যযোগ্য কৃতিত্ব হরচন্দ্র ঘোষের। তিনিই প্রথম শেক্সপীয়ারের নাট্যনুবাদ করেন বাংলায়। প্রথম অনুবাদ 'ভানুমতী চিত্তবিলাস।' রচনা সাল ১৮৫২। নাটকটি দি মার্চেন্ট অব ভেনিসের অনুবাদ। কেন এই নাটক অনুবাদ করলেন, সে সম্পর্কে হরচন্দ্র ঘোষ ভূমিকায় কিছু বক্তব্য পেশ করেছেন। বক্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখছেন—

—'এতদ্দেশীয় বালকবৃন্দের জ্ঞান বৃদ্ধ্যর্থ উৎসাহান্বিত ইংলণ্ডীয় কোন বিচক্ষণ মহাজনের পরামর্শক্রমে আমি শেক্সপিয়র নামক ইংলণ্ডীয় মহাকবির স্বনাম-প্রসিদ্ধ মহানাটক হইতে 'মরচেন্ট-অফ-ভিনিস' ইত্যভিধেয় অপূর্ব কাব্যের আনুপূর্বিক অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ কাব্যের অনেকানেক স্থানের ভাব দেশীয় ভাষার ভাবের সহিত ঐক্য হয় না দেখিয়া কতিপয় প্রাচীন জ্ঞানবান মহাশয় উল্লিখিত কাব্যের আখ্যানের মর্ম্মমাত্র গ্রহণপূর্বক আমূলাৎ দেশীয় প্রণালীতে রচনা করিতে যুক্তিদান করিলাম।—'

হরচন্দ্র ঘোষের জবানীতেই জানা যায়, গোড়া থেকেই, শেক্সপীয়ারকে আমরা কোর্তা-কামিজ পরিয়ে 'শেক্ষপীয়র' বানিয়ে নিয়েছি এবং এই মনোভাব হরচন্দ্র ঘোষের দ্বিতীয় অনুবাদ 'চারমুখ চিত্তহরা' নাটকেও পাই। রোমিও-জুলিয়েট কাহিনীটির ঘটনাস্থল তিনি করেছেন কর্ণাট। ভোজবংশের রাজা মহীশূরের পুত্র চারুমুখ অর্থাৎ রোমিও এবং সিন্ধুরাজ অংশুমানের কন্যা চিত্তহরা অর্থাৎ জুলিয়েট। তা ছাড়া নাটকের শুরুতে সংস্কৃতরীতি অনুযায়ী নান্দী সূত্রধার, নর্তকী ইত্যাদিও জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

হরচন্দ্র ঘোষের পর শেক্সপীয়ার অনুবাদের প্লাবন বয়ে যায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেণীমাধব ঘোষের ভ্রমকৌতুক (কমেডি অব এররস্), তারিণীচরণ পালের ভীম সিংহ (ওথেলো), হরলাল রায়ের রুদ্রপাল (ম্যাকবেথ), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জুলিয়াস সীজার, প্রমথনাথ বসুর

অমর সিংহ (হ্যামলেট), যোগেন্দ্র নারায়ণ দাস ঘোষের অজয় সিংহ-বিলাসবতী (রোমিও-জুলিয়েট), তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের ম্যাকবেথ, জনৈক অজ্ঞাত নামার মদনমঞ্জরী (উইন্টারস টেল), প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়ের সুরলতা (দি মার্চেন্ট অব ভেনিস), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভ্রান্তি-বিলাস (কমেডি অব এররস্), চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রকৃতি নাটক (টেমপেস্ট), কবি হেম বন্দ্যোপাধ্যায়ের নলিনীবসন্ত (টেমপেস্ট) ও রোমিও-জুলিয়েট এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের ম্যাকবেথ। বালক রবীন্দ্রনাথের ম্যাকবেথ কাব্যানুবাদও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

তালিকাটি পূর্ণাঙ্গ নয়, তবে প্রধান প্রধান বই এর মধ্যে রয়েছে। আবার একই বইয়ের অনুবাদে এক-একজন লেখক এক-এক রকম আঙ্গিক নিয়েছেন। কেউ লিখেছেন কবিতায়, কেউ গদ্যে। একই অনুচ্ছেদের অনুবাদ দুজনের হাতে কীভাবে দু'রকম দাঁড়ায়, তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

'ম্যাকবেথ' নাটকের শুরু তিন ডাইনী দিয়ে। অতি পরিচিত সেই অংশটির অনুবাদ গিরিশচন্দ্র ঘোষ পরিণত বয়সে করেছেন এইভাবে।—

'দিদিলো বল্‌না আবার
মিলব কবে তিন বোনে
যখন ঝরবে সেথা
ঝুপুর ঝুপুর
চক চকাচক হানবে চিকুর
কড় কড়াকড় কড়াৎ কড়াৎ
ডাকবে যখন ঝনঝনে।"

বালক রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ একটু অন্যরকম এবং আরও বেশী মূলানুগ। অসম্পূর্ণ এই অনুবাদের শুরু বালক-কবি করেছেন ইংরেজি বাক্যের ঝঙ্কার বজায় রেখে। তিনি লিখেছেন—

"ঝড়বাদলে আবার কখন
মিলব মোরা তিনজনে,

ঝগড়াঝাটি থামবে যখন
হারজিত সব মিটবে রণে।

সে যাই হোক, শেক্সপীয়ারের বিভিন্ন নাটকের অনুবাদের ধারা আজও অব্যাহত এবং গদ্যে পদ্যে, কাব্যে-নাটকে নানাভাবে শেক্সপীয়ারের সব নাটকই বহু লেখক বহুভাবে বাংলায় প্রকাশ করেছেন। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তও হ্যামলেট ও ম্যাকবেথের উত্তম অনুবাদ করে চমক লাগিয়েছেন। তা ছাড়া শেক্সপীয়ারের সনেট ও গানের অনুবাদ বাংলা সাময়িকপত্র খুললেই নজরে পড়ে। সম্প্রতি জুলিয়াস সীজার চরিত্রকে অন্যভাবে প্রকাশ করার চেষ্টাও প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

শুধু অনুবাদ নয়, বাংলা নাটক জন্মলগ্ন থেকেই শেক্সপীয়ারের নাট্যশৈলী আর চরিত্রচিত্রণ রীতিতে আচ্ছন্ন। প্রত্যক্ষ অনুবাদ নয়, অথচ শেক্সপীয়ারের কোন একটি চরিত্রের গুণে প্রভাবিত, এমন বহু নাটকের নজীর রয়েছে। প্রথমেই বলা যেতে পারে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতিনাট্য 'পুনর্বসন্ত' নাটকের নাম। এতে প্রত্যক্ষ প্রভাব এ মিডসামার নাইটস ড্রীমের। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়েরই 'তারাবাই' নাটকে সূর্যমলের পত্নী 'তমসা' লেডি ম্যাকবেথেরই অনুকরণ। দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী' নাটকে হলধর-জগদম্বা ভূমিকা দুটি 'মেরী ওয়াইভস অব উইণ্ডসর' থেকে নেওয়া।

গিরিশ ঘোষে সেই প্রভাব আরও বেশী। তাঁর অনেক নাটকের বহিরঙ্গ শেক্সপীয়ারের ছাঁচে ঢালা। তা ছাড়া 'জনা' নাটকের 'জনা' চরিত্রের আদর্শ 'কিং রিচার্ড দি থার্ড' নাটকের মার্গারেট। মার্গারেট ষষ্ঠ হেনরীর বিধবা পত্নী। তাঁর স্বামী অন্যায়ভাবে নিহত হন এবং তাঁর একমাত্র পুত্র যৌবনে শত্রুর হাতে মারা যান। 'জনা' নাটকের 'বিদূষক' চরিত্রেও কিং হেনরি দি ফোর্থ নাটকের ফলস্টাফ চরিত্রের ছায়া আছে। গিরিশ ঘোষের 'স্বপ্নের ফুল' গীতিনাট্যেও এ মিডসামার নাইটস ড্রীমের প্রভাব। তাঁর 'বিষাদ' নাটকে রয়েছে

হ্যামলেটের অনুকরণে রাজমাতা ও সরস্বতীর ছায়ামূর্তির অবতারণা।

এই ধরনের ছোটখাট প্রভাব অন্যদের রচনায়ও রয়েছে। মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী নাটকের ভীমসিংহ চরিত্র কিং লীয়রের অনুরূপ এবং ভীমসিংহের ছোট ভাই বলেন্দ্র সিংহ 'দি লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ অব কিং জন' নাটকের 'ফিলিপ দি ব্যাস্টার্ড' চরিত্রের ছায়াতে গড়া। দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' নাটকে রোমিও-জুলিয়েটের অনুকরণে ললিত-লীলাবতীর একটি দীর্ঘ প্রণয় দৃশ্য জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'রক্ষঃরমণী' নাটকে টেমপেস্টের প্রভাব যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। তেমনই অমৃতলাল বসুর 'কৃপণের ধন' প্রহসনও শেক্সপীয়ারের প্রভাবমুক্ত নয়। মন্মথ ও কুন্তলার প্রেম মার্চেণ্ট অব ভেনিসের শাইলক-কন্যার প্রেম-বিবরণের অনুরূপ। যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' নাটকের জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের চরিত্র তো হ্যামলেট চরিত্রের ছাঁচে ঢালা। সেই তুলনায় রবীন্দ্রনাথের নাটকে শেক্সপীয়ারের প্রভাব নেই বললেই চলে। শুধু 'রাজা ও রানী' নাটকে খলচরিত্র রেবতীর মধ্যে লেডি ম্যাকবেথের সামান্য ছায়া ধরা পড়ে।

নাটকের বহিরঙ্গে বা নাটকীয় চরিত্রে শেক্সপীয়ারের পরোক্ষ বা অপরোক্ষ প্রভাব ছাড়াও বাঙালী 'লেখকদের চিন্তাধারায় তাঁর প্রভাব অজস্র। বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে শেক্সপীয়ারের বিভিন্ন নাটক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তব্য আরও স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করেছেন। দীনবন্ধুর 'কমলে কামিনী' নাটকে 'মোটো' বা উদ্দেশ্য হিসেবে 'ম্যাকবেথ' থেকে দুটি পদ তুলে দেওয়া আছে। আর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তো চন্দ্রগুপ্ত নাটকের দু'একটি জায়গায় 'দি মার্চেণ্ট অব ভেনিস' থেকে হুবহু অনুবাদ করে দিয়েছেন।

একটি উদাহরণই যথেষ্ট। শেক্সপীয়ারের শাইলক বলছে।

"I am a Jew. Hath not a Jew eyes? Hath not a

Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions?" তেমনই 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে শূদ্রানী মুরা বলেছেন—"শূদ্রানী!—শূদ্রানী মানুষ নহে? তার কি ক্ষত্রিয়েরই মত হস্তপদ নাই? মস্তিষ্ক নাই? হৃদয় নাই? এত ঘৃণা!—উত্তম। দেখাবো একবার শূদ্রের শক্তি।"

আর একটি উদাহরণ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্যের একটি অংশ। বইটির "কোন্ মূঢ় চিত্রকরে পদ্মদেহ চিত্র করে" ইত্যাদি অংশটি 'কিং জন' নাটকের চতুর্থ অঙ্ক ২য় দৃশ্যের "to gild refined gold" ইত্যাদি কয়েকটি ছত্রের অনুবাদ।

প্রভাবের কথা বাদ দিই, শেক্সপীয়ার বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ চিন্তানায়কগণ নানা দৃষ্টিকোণ থেকে শেক্সপীয়ারের বিশ্লেষণ করেছেন। মজার কথা এই, শেক্সপীয়ারের প্রসঙ্গে কালিদাস অনিবার্যরূপে এসে পড়েছেন।

এই প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'কালিদাস ও সেক্ষপীয়র' প্রবন্ধটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর বক্তব্য, 'সেক্ষপীয়র মেনকা হইতে পারেন, বাল্মীকি উর্বশী হইতে পারেন, হোমার রম্ভা হইতে পারেন, কিন্তু কালিদাস তিলোত্তমা।' তিনি দুই মহাকবির তুলনা করে অন্য এক জায়গায় বলেছেন 'কালিদাসের বাহ্যজগতে যেরূপ অসীম আধিপত্য, সেক্ষপীয়রের অন্তর্জগতে তেমনি। অন্তর্জগতেরও এক অংশে কালিদাস সেক্ষপীয়রের ন্যূন নহেন। যেখানে হৃদয়ের সুন্দর ও কোমল ভাবগুলি বর্ণনা করিতে হইবে, সেখানে বোধ হয় কালিদাস অধিক মিষ্ট লাগে। কিন্তু অন্তে সর্বত্র সেক্ষপীয়র উপমারহিত।'

বঙ্কিমচন্দ্র কালিদাস এবং শেক্সপীয়ায়ের তুলনা প্রসঙ্গে মিরাণ্ডা ও শকুন্তলার চমৎকার একটি আলোচনা করেছেন 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থে। তার মতে সেক্ষপীয়রের এই নাটক (টেমপেস্ট) সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক (শকুন্তলা) নন্দনকাননতুল্য। কাননে সাগরে

তুলনা হয় না। যাহা সুন্দর, যাহা সুদৃশ্য, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুরব, যাহা মনোহর, যাহা সুখকর, তাহাই এই নন্দনকাননে অপর্যাপ্ত, স্তূপীকৃত, রাশি রাশি অপরিমেয়। আর যাহা গভীর, দুস্তর, চঞ্চল, ভীমনাদী তাহাই এই সাগরে।"

রবীন্দ্রনাথও শেক্সপীয়র সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেন নি। 'বলাকার' একটি কবিতা তিনি শেক্সপীয়ারের নামে উৎসর্গ করেছেন এবং বহু সাহিত্য নিবন্ধে শেক্সপীয়ারকে নানাভাবে বিচার করেছেন। 'সাহিত্যের প্রাণ' প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি বলেছেন—'শেক্সপীয়রে আমরা চিরকালের মানুষ এবং আসল মানুষটি পাই। কেবল মুখের মানুষটি নয়। মানুষকে একেবারে তার শেষ পর্যন্ত আলোড়িত করে শেক্সপীয়র তাঁর সমস্ত মনুষ্যত্বকে অবারিত করে দিয়েছেন।' রবীন্দ্রনাথের মতে শেক্সপীয়রের মধ্যে 'একটি উচ্চ দর্শনশিখর আছে, যেখান থেকে মানব প্রকৃতির সর্বাপেক্ষা ব্যাপক দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।'

সম্ভব এই কারণেই কোন দেশ, কোন কাল শেক্সপীয়ারকে অস্বীকার করতে পারেনি। বাংলা দেশ পারেনি, বিংশ শতাব্দীর মানুষ আমরাও পারিনি।

বিনা স্বদেশী ভাষা

যাঁরা বলেন ইংরেজীকে তালাক দিলে দেশের সর্বনাশ, সংহতির সংহার, আমি তাঁদের দলে নাই। সংহতির সূত্ররূপে যদি কোনো ভাষা ভারতে থেকে থাকে তবে তা' ইংরেজী নয়, সংস্কৃত। 'প্রতিক্রিয়াশীল' মনে হতে পারে, কিন্তু অসত্য নয়। তার প্রমাণ ভারতের ইতিহাস।

আমাদের সাম্প্রতিক জাতীয়তাবোধ, যা মুখ্যত রাজনৈতিক, তার মূলে নিশ্চয়ই রয়েছে ইংরেজী ভাষা-সাহিত্য-আইনে সুসজ্জিত ব্রিটিশ শাসন। তবে এহো বাহ্য, ভারতীয় ঐক্য বা ভারতবোধের মূলে আছে অন্য জিনিস। আছে সংস্কৃত ভাষা, রামায়ণ-মহাভারত, রাধাকৃষ্ণের মত কিছু লৌকিক কাহিনী, কবির-দাদু-নানক-চৈতন্যের বাণী, আছে হিন্দু মুসলমানের যুগল সাধনায় সৃষ্ট সঙ্গীত আর চিত্রকলা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে রথচাইলডের পাশে যীশুকে বসিয়ে যদি ব্যাংকের টাকার হিসেবে দ্বিতীয় জনের কৃতিত্বের বিচার করি, তাহলে যেমন তুলনাটা দাঁড়ায় হাস্যকর, ঠিক তেমনি পাশ্চাত্যরীতির অন্ধ অনুকরণে ভারতীয় ঐক্যের সূত্র খোঁজাও অনর্থকর।

সোজা কথায় একই রাজধানী, একই প্রধানমন্ত্রী, একই সংবিধান নিয়ে যতটা, তার চেয়ে আমরা ভারতীয়রা বেশী ঐক্যবদ্ধ সংস্কৃত-সংস্কৃতির সূত্রে। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে কিংবা কেরল-কর্ণাটকে-মহারাষ্ট্রে কিংবা পাঞ্জাব-রাজস্থান-গুজরাতে যে মনের মিল তার মূলে রয়েছে ওই সংস্কৃত—যাকে আমরা বরবাদ করেছি মুখের ভাষা থেকে।

ঘটনাচক্রে সংস্কৃতের সঙ্গে হিন্দু ধর্ম আর দর্শনের সম্পর্কে অঙ্গাঙ্গী, কিন্তু প্রকৃত বিচারে এ ভাষা কোনো বিশেষ ধর্ম বা দর্শনের নয়,

সমগ্র জাতির। সেক্ষেত্রে জয়দেব কিংবা কালিদাস কিংবা বাল্মীকি যতটা সর্বভারতীয়, বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় রবীন্দ্রনাথও ততটা নন। জয়দেবের গীতগোবিন্দ বাঙলাদেশের সীমানা পেরিয়ে পৌঁছেছে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, সৌরাষ্ট্র থেকে মণিপুর—ভারতের প্রতিটি জনপদে। গীতাঞ্জলি বা গোরা যায় নি। আর সংহতির সূত্ররূপে ইংরেজীর দোহাই যাঁরা পাড়েন, তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাই, ইংরেজী ভাষায় জগদ্বিখ্যাত ভারতীয় সাহিত্যিক মূলকরাজ আনন্দ, আর, কে, নারায়ণ বা কমলা মার্কণ্ডেয় জনপ্রিয়তা দূরে থাক, ততটা ভারতীয়ই হতে পারেন নি।

তা ছাড়া যাঁরা বলেন, ইংরেজ শাসনেই সারা ভারতে হয়েছে ভাবের বিনিময়, ঘটেছে মনের মিলন, তাঁরাও মূল সত্য এড়িয়ে বিন্দুতে সিন্ধু দেখেন। ভাবের বিনিময় আর মনের মিলন যদি সত্যি সত্যি কিছু হয়ে থাকে, তবে তা বিমান-মোটর রেলপথে বিস্তৃত আধুনিক ভারতে হয় নি, হয়েছে প্রাচীন আর মধ্যযুগে। সংস্কৃতকে হটিয়ে দিয়ে ইংরেজী যখন আমাদের যোগসূত্রের ভাষা, তখন থেকেই আমরা জানি না কেরলে কোন ধরনের সাহিত্যচর্চা চলছে, গুজরাতে চিন্তাধারার ধরন কী।

অথচ এ জিনিস আগে ছিল না, তামিলনাদের ভক্তিবাদ প্রভাবিত করেছে বাংলাদেশের গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকে, গোপীচাঁদ ময়নামতীর কাহিনী পূর্ববঙ্গ থেকে ছুটে গিয়েছে পাঞ্জাব-রাজস্থান-উত্তর প্রদেশে, মনসামঙ্গলের কাহিনী সুদূর দক্ষিণ ভারত পেরিয়ে সমৃদ্ধ করেছে বাংলা সাহিত্যকে। আর রাধাকৃষ্ণ উপাখ্যান? সে তো হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সারা ভারতের কবিকুলের প্রিয়তম বিষয়। আদি শঙ্কর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চষে বেড়িয়েছেন, সেই কবে, চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারতের কোনো দ্রষ্টব্য স্থান বাদ দেন নি এবং এমন অসংখ্য ভারত পথিকের নাম আমার হাতের কাছেই রয়েছে, যাঁরা এ যুগের পর্যটকদের চেয়েও বেশি দেখেছেন

ভারতবর্ষকে। ফরিদপুরের একটি গণ্ডগ্রামের অধিবাসী হয়েও মধুসূদন সরস্বতী সেই কবে ষোড়শ শতাব্দীতে হয়েছিলেন সারা ভারতের পূজ্যপাদ পণ্ডিত, আর এই বিংশ শতাব্দীতে অসাধারণ পণ্ডিত হয়েও গোপীনাথ কবিরাজের নাম খুব কম লোকেই জানেন।

ভারত-বোধ জাগ্রত করার প্রতিবন্ধকরূপে ইংরেজী ভাষার দান আরও আছে। তালিকা দীর্ঘ না করে একটি মাত্র উদাহরণ দিই। আসামের পার্বত্য রাজ্য নিয়ে দিল্লির দুশ্চিন্তার অন্ত নেই; যাঁরা ইংরেজী নইলে 'গেল গেল' রব তোলেন, তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাই, এই অনৈক্যেরও অন্যতম কারণ ইংরেজী ভাষা। নাগাভূমি, মনিপুর ও মিজোপাহাড় সংলগ্ন এলাকা। নৃতাত্ত্বিক বিচারেও এই তিন এলাকার অধিবাসীর মিল। তবু সমস্যা শুধু নাগাভূমি আর মিজো-পাহাড়ে, মণিপুর নয়।

তার কারণও রয়েছে। মণিপুর সংস্কৃত ভাষা আর সাহিত্যের মাধ্যমে ভারতের অঙ্গরাজ্য হতে পেরেছে প্রকৃত অর্থে। চৈতন্যদেবের কৃপায় নবদ্বীপ-বৃন্দাবন ওদের তীর্থভূমি, রামায়ণ-মহাভারত আর শ্রীমদভাগবত অবশ্যপাঠ্য এবং রাধাকৃষ্ণের নাম অষ্টপ্রহরের সঙ্গী।

এই ভারতীয়ত্বের মূলে সংস্কৃত—যা নাগাভূমি বা মিজোপাহাড়ে আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। সেখানে ওদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ইংরেজী ভাষায় মাধ্যমে এবং ইংরেজীই ওদের দূরে দূরে রেখেছে সর্বভারতীয় চিন্তাধারার উৎস থেকে। কোনো নাগা বা মিজো যদি ভাবতে পারত কাশী মথুরা-বৃন্দাবন আমার, রামায়ণ-মহাভারত আমার. কালিদাস-জয়দেব আমার, তাজমহল খাজুরাহো আমার, আলাউদ্দিন খাঁ, ভাতখণ্ডে আমার, তাহলে বাঙালী অসমীয়া গুজরাত মহীশূরীর সঙ্গে একাত্ম হতে পারত, বলতে পারত আমরাও পুরোপুরি ভারতের।

পারেনি। তার কারণ, আগেই বলেছি, ইংরেজী ভাষা। পৃথক রাজ্যের দাবির মধ্যে অভারতীয়ত্ব নিশ্চয়ই নেই, তবে যখন দাবি

ওঠে সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের, তখনই মনে হয় তার মূলে শুধু অন্যায় অবিচার নয়, অন্য কিছুও বুঝিবা রয়েছে। আর জাতিগত বিচারে যদি বিচ্ছেদের প্রয়োজন হত, তাহলে মণিপুরও বাদ পড়ত না, কিন্তু কই, মণিপুর তো এ ব্যাপারে উৎসাহী নয়!

অর্থাৎ ইংরেজী যতদিন আছে আমরা ষোলআনা স্বাধীন হতে পারব না। দুশ বছর তো আমরা ইংরেজী ভাষার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে আছি, কাজ কি এগিয়েছে? এগোয়নি, বরং বিভেদটাই বেড়েছে।

তবে হ্যাঁ, আমার প্রতিপাদ্য বিষয় এই নয় যে, সংস্কৃত আবার ভারতের রাষ্ট্রভাষা হোক, উচ্চশিক্ষার বাহন হোক, আমরা আবার চতুষ্পাঠীতে গিয়ে শব্দরূপ ধাতুরূপ মুখস্থ করি। আমার শুধু বক্তব্য ভারতে সংহতির সূত্র ইংরেজী নয় এবং যদি কোনো ভাষাকে সূত্রধরের সম্মান দিতে হয়, তবে তা সংস্কৃতের প্রাপ্য। রাষ্ট্রীয় ফলকে 'সত্যমেব জয়তে' কিংবা আকাশবাণীর শীল-মোহরে 'বহুজন সুখায় বহুজন হিতায়' ইত্যাদি বাক্যগুলি যত সহজে আমরা নিতে পেরেছি, অন্য কোনো ভাষার আশ্রয় নিলে তা পারতাম না।

মোট কথা সত্যি সত্যিই যদি আমরা সংহতি চাই, তাহলে সংস্কৃতচর্চা বজায় রাখতে হবে, মাতৃভাষাকে সর্বস্তরের শিক্ষার বাহন করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসায়িক প্রয়োজনে একটি স্বদেশী ভাষা আনতে হবে। 'আংরেজি হঠাও'-ওয়ালাদের দলে আমি নই, হিন্দী চাপানে-ওয়ালাদেরও আমি অশ্রদ্ধা করি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করি স্বদেশী ভাষা বিনা আমাদের আশা মেটার সম্ভাবনা কম।

এই প্রসঙ্গেই বলি মাতৃভাষাকে এখনও যাঁরা 'নেটিভ ল্যাংগুয়েজ' বলে অন্দরমহলে আটক রাখতে চান, ইংরেজী-বর্জিত ভারত চিন্তায় আনতে পারেন না, তাঁদের একটিবার শুধু রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। আমি একথা মানি নে যে, বাংলা বা তামিল বা গুজরাতির দৌড় কেবল পাঠশালা

তক্; এম. এ, এম. এস-সি বা ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া চলে চলে না। ১৯৪০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় গণিত, জ্যামিতি, ভূগোল, ইতিহাস বাংলায় লেখার এবং পড়ার অনুমতি দিলেন, তখন 'হায় হায়' রব পড়ে গিয়েছিল চারদিকে। সবারই মুখে এক কথা—এ কী করে সম্ভব? বাংলাতে পদ্য পড়া চলে বটে, কিন্তু উইলিআম দি কংকরার-এর জীবনী কিংবা অষ্টম উপপাদ্য পড়া?—নেভার নেভার।

পরে দেখা গেল সন্দেহবাদীদের ভয় অহেতুক, বাংলাতে দিব্যি কাজ চলছে। এবং এখন লাখ লাখ ছেলে ওই বাংলাতেই স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়ে কলেজে ঢুকছে। তাঁদের জ্ঞান ইংরেজি-পড়ুয়াদের চেয়ে কম নয়, একথা আশা করি আলাদা বলার প্রয়োজন পড়ে না।

ঠিক একই জিনিস ঘটেছিল ১৯৪৮ সালে। সেবারও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক করেন বি-এ এবং বি এস-সি পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল বাংলায়ও উত্তর দেওয়া চলবে। আবার আপত্তি ওঠে নানা মহলে। কিন্তু সেই আপত্তি ধামা চাপা দিয়ে বাংলা ভাষায় পরীক্ষা দেওয়া এবং ক্লাসে পড়া চলছে, চলবে।

এখন আবার একই সুরে শুনতে পাচ্ছি বি-এ পর্যন্ত চলতে পারে, তবে এম-এ ক্লাশে নৈব নৈব চ। তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাই সত্যেন বসু মশাই এম. এস-সি ক্লাসে পদার্থ বিদ্যা পড়াতেন বাংলা ভাষায়। তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝতে কোনো অসুবিধে হয়নি কিংবা জ্ঞানেও ঘাটতি পড়েনি।

ভাল পাঠ্য বই নেই বলে যাঁরা চেঁচামেচি করেন, তাঁদের জানা দরকার মাতৃভাষায় লেখাপড়ার সিদ্ধান্ত নিলে বইয়ের জন্যে কিছু আটকে থাকবে না। সাঁতার শিখতে গেলে জলেই নামতে হয়, ডাঙায় দাঁড়িয়ে 'পারব না পারব না' বলে চেঁচালে সাঁতার শেখা দূরে থাক, জলাতঙ্কে ভুগে মারা যাওয়ারই আশংকা। পুকুর কাটা হোক,

বৃষ্টির জলে পুকুর ভরতি হোক, তারপর আমি সাঁতার শিখতে জলে নামব—এই সিদ্ধান্ত নিলে ন-মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবেন না।

বিভিন্ন প্রয়োগ ও শব্দ বাংলায় রূপান্তরের প্রশ্ন? মোটেই কঠিন নয়। প্রয়োজনবোধে আমরা কিছু ইংরেজী শব্দ চালু রাখব। টেবিল চেয়ার যদি গ্রহণ করতে পারি, অক্‌সিজেন মনোকটোলিডনও নিতে পারব। তাছাড়া ওসব জিনিস পড়তে গেলে ইংরেজীতেও কুলোয় না। খোদ ইংরেজীকেও বহু শব্দ ধার করতে হচ্ছে লাতিন থেকে। বিশেষ করে চিকিৎসা বিদ্যা ও উদ্ভিদ বিদ্যায়।

ইংরেজীতে পড়াশোনা না করলে আমরা কূপমণ্ডুক হয়ে থাকব, সেটাও সুযুক্তি বলে ধরা ঠিক হবে না। জাপান, চীন কিংবা মিশরের লোকেরা আমাদের চেয়ে অশিক্ষিত নয়। তাছাড়া আর একটি কথা বলা দরকার। গোড়াতে দেখতে হবে একটি সাধারণ ছেলে নিজের মাতৃভাষা না অন্য বিদেশী ভাষায় পড়াশোনা করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। দু'শ বছর চেষ্টা করেও এদেশের শতকরা দু ভাগের বেশি লোককে আমরা ইংরেজী-নবিশ করতে পারিনি, সুতরাং পনেরো কুড়ি বছর ধরে ভুল ইংরেজী শেখানোর পণ্ডশ্রম না করে মাতৃভাষাকে আগাগোড়া শিক্ষার বাহন করলে 'এপরোপ্রিয়েট্ প্রিপজিশন' আর 'কগনেট অবজেক্‌ট'এর গোলক ধাঁধায় ঘুরে মরতে হবে না।

আরও এক ধাপ এগিয়ে আমি বলি, ইংরেজী সাহিত্যে যদি পাঠ্য বিষয় থাকে, তাহলে তা'ও বাংলায় উত্তর দেবার অধিকার যেন থাকে। ইংল্যাণ্ডে ফ্রান্সে এই নিয়ম চালু। ইংল্যাণ্ডে কেউ ফরাসী সাহিত্য পাঠ্য বিষয় হিসেবে নিলে তার উত্তর দেবে ইংরাজীতে। তেমনি, বি-এ পরীক্ষায় লেডি ম্যাকবেথের চরিত্র বাংলাতে লেখার অধিকার যদি আমার থাকত, তাহলে আমি বি-এ পরীক্ষায় আরও ভাল লিখতাম, বেশি নম্বর পেতাম।

ইংরেজী ভাষা এবং ইংরেজী সাহিত্য—দুটোকে আলাদা করে

দেখা দরকার। ভাষা শিক্ষা যেখানে প্রধান, সে ক্ষেত্রে ইংরেজীতেই উত্তর দিতে হবে। আর সাহিত্য যদি মুখ্য হয় তাহলে 'ইন' আর 'অ্যাট-এর কচকচিতে না গিয়ে দেখা দরকার সাহিত্যের রস ছাত্রের লেখায় প্রকাশ পেয়েছে কি না। ইংরেজী ভাষার সঙ্গে আমার বিবাদ নেই, কিন্তু ভাষা জ্ঞান প্রচারের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালেই আমার আপত্তি। সে ক্ষেত্রে নিজের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষাই আত্মপ্রকাশের বাহন হতে পারে না।

এবারে আসি শেষ বক্তব্যে। যোগাযোগকারী ভাষা হিসেবে হিন্দীকে গ্রহণ করার মধ্যে লজ্জা নেই। আমাদের অজ্ঞাতসারেই হিন্দী উত্তর পূর্ব ও পশ্চিমভারতের ব্যবসায়িক ভাষার স্থান নিয়েছে। তাছাড়া যা এককালে ছিল মথুরা অঞ্চলের উপভাষা, তাই তার নিজের গুণে উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাত জয় করে মহারাষ্ট্রের দিকে এগিয়েছে।

তাছাড়া সর্বভারতীয় মর্যাদা পাবার পক্ষে হিন্দীর আর একটি দাবি তার নাম। বাঙলা বাংলাদেশের, ওড়িয়া ওড়িশার, মলয়ালম কেরলের ; কিন্তু হিন্দি কোনো বিশেষ রাজ্য বা প্রদেশের ভাষা নয়, হিন্দ্-এর। গান্ধীজীর মাতৃভাষা গুজরাতি হওয়া সত্ত্বেও সারা ভারতের নেতৃত্ব নিতে হিন্দীরই ভরসা করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র ও শ্যামাপ্রসাদও ইংরেজী বদলে হিন্দীর মাধ্যমেই সর্বভারতীয় নেতা হতে পেরেছিলেন। হিন্দীর জন্যে ওকালতি করেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ।

হিন্দিভাষীদের আধিপত্যের প্রশ্নও অবান্তর। আমরা যাঁরা ইংরেজী-শিক্ষিত, তাঁরাও তো এখন কমপার্টমেন্টালে বি-এ পাশ করে কাব্যতীর্থ বা ব্যাকরণশাস্ত্রী উপাধিধারী পণ্ডিত ব্যক্তিদের উপর আধিপত্য বিস্তার কবে আছি? চাকরির ক্ষেত্রে অসম প্রতিযোগিতার প্রশ্ন? এ যুক্তিও টেঁকে না। ইংরেজী শিখে আমরা এককালে যেমন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের পুলিশ সার্জেন্ট আর রেলের গার্ড ছাড়া

কোনো চাকরি দিই নি, তেমনি হিন্দী শিখে নিয়ে হিন্দী-ওয়ালাদের সঙ্গেও পাল্লা দিতে পারব।

বাকি থাকে দক্ষিণ ভারত। খোঁজ নিলে জানা যাবে, হিন্দী প্রচার সমিতির শাখা দক্ষিণ ভারতেই বেশি। সংস্কৃত ভাষা যখন উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে প্রথম যায় একই ধরণের আপত্তি উঠেছিল নানা মহলে। আর এখন? সংস্কৃতভাষার ওরাই অগ্রণী।

তবে কি আমরা ইংরেজী আদৌ শিখব না? শিখব, শিখব নিশ্চয়ই শিখব। তবে তার মানে এই নয় যে, বিদেশী একটা ভাষাকে চিরকালের মত অবশ্যপাঠ্য করে রেখে দিয়ে 'প্রাণের আরাম মনের আনন্দ আত্মার শান্তি' বলে আখ্যা দিয়ে ইংরেজী' ইংরেজী' জপ করতে হবে। ইংরেজী না শিখেও যদি চীন জাপান আন্তর্জাতিক আসরে সগর্বে ঘুরে বেড়াতে পারে, আমরাও পারব। বিদেশে গিয়ে ইংরেজীতে কথা বলতে পারব না এই দুঃখে যদি বিদেশী একটা ভাষা আমরা দেশের পঞ্চাশ কোটি লোকের উপর চাপিয়ে দিই, তাহলে সেটা যদি অন্যায় না হয়, তাহলে অন্যায় কী?

ভারত আমার

প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে কিংবা প্রধানমন্ত্রীর জনসভাতে যাঁরা ভারতের সংহতি প্রত্যক্ষ করেন, আমি তাঁদের দলে নেই। ভাষার লড়াই আর সংবিধানের লড়াই নিয়ে যাঁরা 'গেল গেল' রব তোলেন, তাঁদের সঙ্গেও আমি পুরো সামিল হতে পারি না। সংহতির প্রশ্ন উঠলে আমার চোখে সর্বাগ্রে ভাসে সেই সব লোকের ছবি, যাঁরা রাষ্ট্রপতি পদে কে যাবেন—জাকির হোসেন না সুব্‌বা রাও, গদিতে কে রইল—কংগ্রেস না যুক্ত ফ্রন্ট্, তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না, যারা রাজনীতিসৃষ্ট কৃত্রিম পরিবেশের বাইরে নিজেদের টিঁকিয়ে রেখেছে শত শত হাজার বছর। সংহতির আসল চেহারা আমি তাই দেখি গঙ্গাসাগরে, কুম্ভমেলায়, মইনউদ্দিন চিশতির উরশ-এ; দেখি গ্রামের মেলায়, বাউলের আসরে, পীরের দরগায়, কাশীর ঘাটে।

জানি, বিংশ শতাব্দীর এই রাষ্ট্রনির্ভর শিল্পকেন্দ্রিক যুগে রাজনীতির প্রাধান্য বাড়বেই, কিন্তু এটাকেই যদি একমাত্র সত্য বলে ধরে নিই, তাহলে আমার ধারণা, সংহতির বদলে, বিচ্ছেদের আশংকাই বেশি। ভারতের সনাতন ধারা যদি অন্য খাতে বয় তাহলে বিপরীত পরিণতিই অনিবার্য। বক্তৃতায় ও রচনায় আমরা প্রায়ই উচ্চারণ করি বটে 'ভারত আমার', কিন্তু ভেবে দেখি না কোন্ ভারতের কথা বলছি। এক রাষ্ট্রপতি আর এক সংবিধানে নিয়ন্ত্রিত প্রজাতন্ত্রী যুক্তরাজ্য, না ধর্ম আর সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ এক সুপ্রাচীন ভারতবর্ষ?

অজন্তার গুহাচিত্র, তাজমহলের জালির কাজ, মহাবলীপুরমের মন্দির, হিমালয়, গঙ্গা, ভারত নাট্যম, খেয়াল-ঠুংরি, উপনিষদ আর কবীরের দোঁহা—সব মিলিয়েই ভারতের ছবি আমার কাছে বেশী

স্পষ্ট। ধর্মের লড়াই আর ভূমির লড়াই আগেও ছিল, কোশল-কাঞ্চী-পাঞ্চলে রক্তারক্তিও কম হয়নি, কিন্তু হাজার হাজার বছর পরে হওয়া সত্ত্বেও ওই মহা-ভারতের অখণ্ডরূপ অমলিন। 'ধর্ম' কথাটা ইদানীং অচল এবং প্রগতিবিরোধী হলেও বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসেও অস্বীকার করার উপায় নেই। ভারতের শতকরা নব্বুই ভাগ লোক এখনও ধর্ম ও সংস্কৃতির ছত্রতলে নিশ্চিন্ত প্রশান্তে দাঁড়িয়ে আছে। এই সংস্কৃতি হিন্দুপ্রধান হলেও মুসলমান আউলের মুখে রাধা নাম আটকায় না, 'হরি ওঁ' ধ্বনি মুসলমান গায়কের কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্ত হয়। শত ঝড় ঝাপটা, অভাব অভিযোগের মধ্যেও এদেশে এমন একটা জায়গা আছে, যেখানে হিন্দু-মুসলমান, বিহারী-বাঙালী, হিন্দী-তামিল মানচিত্রের সীমারেখা ভুলে এক। সারা ভারতের জন্যে একটি মাত্র ভাষা চালু না করা পর্যন্ত আমাদের স্বস্তি নই, চিৎকার পেড়ে বলি 'ভাব বিনিময়ের কী হবে' অথচ একবারও তালিয়ে দেখি না কুম্ভমেলায় সমবেত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী যুগ যুগ ধরে কোন্ ভাষায় ভাব বিনিময় করে আসছে, এত উপদ্রবের মধ্যেও কবীর নানক চৈতন্য তুকারাম কী করে জন্ম দিলেন।

আসলে সংহতি ব্যাপারটা আমরা কয়েকজন শহরবাসী ইউরোপের আদলে গড়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছি। আমাদের ইতিহাস শিক্ষা বিদেশী গুরুর পাঠশালাতে। কিন্তু ইতিহাস সব দেশে এক রকম হবে, এমন কোন কথা নেই। যদি তাই হত, তাহলে অভাবিত দারিদ্র্য আর অত্যাচারের কারণে অনেক আগেই এদেশে কমিউনিজম কায়েম হওয়ার কথা।

ভারতের ইতিহাস অন্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে বলেছেন, "ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফতর হইতে তাঁহার রাজবংশ-মালা ও জয়পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন, 'যেখানে পলিটিকস নাই সেখানে আবার হিসট্রি কীসের,' তাঁহারা ধানের

খেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না। সকল খেতের আবাদ এক নহে, ইহা জানিয়া যে-ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্যের প্রত্যাশা করে সে-ই প্রাজ্ঞ।"—কথাটা সত্য। ভারতের স্বভাবই তাকে চিরদিন রাষ্ট্রগৌরবের দিকে উদাসীন রেখেছে। এবং এই স্বভাবের জন্যেই আগরা-দিললির পাশাপাশি কাশী-নবদ্বীপ টিঁকে ছিল, এখনও আছে।

দুঃখের কথা ভারতের সেই সনাতন স্বভাবের স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে দেশের নেতারা অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে সংহতি গড়তে চাইছেন। তাতে লাভ হয়নি, বাইরের বিভেদ আরও বেড়েছে, ভিতরের ঐক্যও জোর পায়নি।

তবে আমার প্রতিপাদ্য এই নয় যে, গণতন্ত্র আর সংসদ ভুলে গিয়ে কেবল অহোরাত্র নাম সংকীর্তন হোক. কলকারখানা ভেঙে দিয়ে শুধু মন্দির মসজিদ গড়ে উঠুক এবং তাতেই ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে; আমি বলতে চাই সংহতিকে জোরদার করার বাসনা যদি থাকে, তবে নতুন কিছুর সঙ্গে পুরাতন সংহতি-সূত্রগুলোকেও জীইয়ে রাখতে হবে। ইংরেজি বা হিন্দী দিয়ে আমরা ভাষার গাঁটছড়া বাঁধতে চাইছি, কিন্তু যে ভাষা সারা ভারতকে ভাবের দিক থেকে দীর্ঘকাল জড়িয়ে রাখতে পেরেছে, সেই সংস্কৃত ভাষাকে স্কুলপাঠ্য থেকে বিসর্জন দিচ্ছি। রাজনৈতিক নেতাদের জীবনী মুখস্থ কবানোর জন্যে আমদের উৎসাহের অন্ত নেই, অথচ রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী শিশুদের কাছে জনপ্রিয় করার কথা মনে পড়ে না।

ভুললে চলবে না সারা ভারতকে এখনও আত্মিক বন্ধনে বেঁধে রেখেছে সংস্কৃত ভাষা রামায়ণ-মহাভারত, আর কিছু লৌকিক কাহিনী। ভারতীয় সভ্যতা আর সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে, সব রাজ্যের সব অধিবাসীর কাছে তার

সমান আদর। রামায়ণ-মহাভারতের অসংখ্য কাহিনী এখনও সারা ভারতের লৌকিক সাহিত্যের উপকরণ এবং ভাল-মন্দ, ঘৃণা-ভালবাসা ইত্যাদি বোধ তৈরী হয়েছে ওই দুই মহাকাব্যের নানা চরিত্র কেন্দ্র করে। কাশী বৃন্দাবন নবদ্বীপ-দেওবন্দ শুধু ধর্মীয় কারণে নয়, জ্ঞানচর্চার জন্যেও নানা প্রান্তকে একত্রে টেনেছে।

আরও হাস্যকর, আমরা কেউ কেউ যখন রাজনীতির টানপোড়েনে পড়ে পৃথক বঙ্গ কিংবা পৃথক তামিলনাদের স্লোগান তুলি। রসগোল্লা, কলকাতা, রবীন্দ্রসংগীত আর প্রতাপাদিত্য নিয়েই তো আমি বাঙালী নই, আমার বাঙালীত্বের সঙ্গে মিশে রয়েছে কাশী-পুরী, কালিদাস-আমির খসরু তাজমহল-অজন্তা 'অবাঙালী' অনেক জিনিস। সারা ভারতের ঐতিহ্য আমার নাড়ির মধ্যে, এবং 'সোনার বাঙলা' 'ভুবন-মনমোহিনী' ভারতবর্ষেরই ভিতরে!

এই সত্য তাদের কাছে স্বচ্ছ, যারা রাজনীতির মঞ্চ থেকে অনেক দূরে যারা ইউরোপীয় আদর্শে 'সংহতি চাই' বলে চেঁচায় না। যত গণ্ডগোল তথাকথিত আধুনিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত আমাদের মত কিছু নাগরিকদের নিয়ে, যারা সংখ্যায় কম হয়েও নিজেদের ধ্যান ধারণা অধিকাংশের উপর চাপাতে চাই, মূল উচ্ছেদ করে গাছের আগায় জল ঢালি। সংহতি নিয়ে অনেক নেতার অনেক কথাই শুনেছি, কিন্তু এখনও মনে হয় মনুমেণ্টের এ পাশে উচ্চারিত কোন রাজনৈতিক বক্তৃতার চেয়ে ওপাশে নিত্য সন্ধ্যায় তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ অনেক বেশী বাস্তব। গুলি, কারফু, ট্রাম-বাস পোড়ানোর মাঝখানে যখন প্রভাতে গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে 'জবাকুসুম সঙ্কাশং' মন্ত্র শুনি, মনে হয় গঙ্গা এখনও একই আছে, একই খাতে সে ঠিক বইছে, সংহতি রাখতে আইন বানানোর কোন দরকার নেই।

পুরনো চিঠির তাড়া

বদ অভ্যেস বলুন আর যাই বলুন, পরের চিঠি পড়ার মত আনন্দ আর নেই। বিশেষ করে পুরনো চিঠি। লুকিয়ে দু'চারখানা পড়তে পারলে চেনা লোককে অচেনা মনে হয়, অচেনাকে চেনা যায়। এ অনেকটা আড়ি পেতে পরের কথা শোনার মত। দুপুরের ট্রাম বা সন্ধ্যের সিনেমাহলে পেছনের আসনের ফিস্‌ফাস-নিচু গলার কথা শুনে হঠাৎ যেমন অপরিচিত মানুষের তদধিক অপরিচিত জীবন জানা হয়ে যায়, তেমনি পথের ধারে কিংবা বাড়ির কিনারে কুড়িয়ে পাওয়া পুরনো চিঠি অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে অনেক নতুন রসদ নিয়ে আসে।

সে সব চিঠির স্বাদ আলাদা। কলেজ স্ট্রীট বরাবর হাঁটতে হাঁটতে হাওয়ায় উড়ে এল একখানা পুরনো চিঠির পাতা। তুলে নিতেই দেখি, মেয়েলি ছাঁদের লেখা। কে একজন তপতী, মধু গুপ্ত লেনের অসিতদাকে ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কিছু লিখেছে। প্রেরক গ্রাহক কাউকেই চিনিনে, কিন্তু অনুমান করতে কষ্ট হয় না, চৌদ্দ বছর আগে লেখা এই ছেঁড়া পাতা প্রেমপত্র।

পড়া শেষ হতেই নানারকম প্রশ্ন। তপতীর সঙ্গে অসিতদার বিয়ে হয়েছে তো? নাকি তপতী অন্য কোন ভদ্রলোকের ঘরণী? কিংবা কে জানে মেয়েটি হয়ত কুমারী থেকেই কোন ইস্কুলে ইতিহাসের দিদিমণি হয়েছে। চিঠিতে অসিতদার বিলেত যাবার কথা ছিল, বিলেত থেকে বোধহয় ফেরেনই নি।

সবই অনুমান। তা হোক, মন্দ লাগে না। এক একখানা চিঠি নিয়ে একটার পর একটা ছোটগল্প গড়ি আর ভাঙি। তবে চেনা লোকের কোন গোপন চিঠি যদি হাতে এসে যায়, তাহলে তো কথাই নেই, মনে হবে দিগ্বিজয় করে ফেলেছি।

পুরনো এবং পরের চিঠি পড়ার হাতেখড়ি আমার ইস্কুল থেকেই। এবং আমার স্বল্প বিদ্যেবুদ্ধির প্রধান উৎস, ওই পরের চিঠি। ছেলেকে লেখা চেস্টারফিল্ড সাহেবের চিঠি পড়ে যেমন সৎপথে চলার অনেক পরামর্শ পেয়েছি, তেমনি মেয়েকে লেখা জওহরলাল নেহেরুর এস্তার চিঠি পড়ে গোটা পৃথিবীর ইতিহাসই আমার জানা হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথকে জেনেছি সমালোচকদের টীকা পড়ে নয় তাঁর লেখা হাজার হাজার চিঠি পড়ে। মানুষটার সম্পর্কে আমার স্বচ্ছ ধারণা হয়েছে চিঠির মারফতেই। তাছাড়া রবীন্দ্র-সাহিত্যের মল্লিনাথ 'ছিন্নপত্র'। ছিন্নপত্র পড়েই কবিকে চিনতে পেরেছি।

পরের চিঠি পড়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলাম কিছুদিন বিশ্বভারতী পুঁথিশালার ভার পেয়ে। সেখানে জমা আছে হাজার খানেকের উপর পুরনো চিঠি। বলা বাহুল্য সব কয়টিই পরের এবং সেগুলো পড়েই দেড়শ দু'শ বছর আগেকার বঙ্গ-সমাজ সম্পর্কে আমার একটা চমৎকার ধারণা হয়ে গেছে।

পরের চিঠি পড়ার তাগিদেই সেখানকার পুরনো চিঠির তাড়া খুলি। খুলতেই বেরিয়ে পড়ল একখানা প্রেমপত্র। লেখিকা শ্রীমতী চম্পকলতিকা দাসী। নিবাস বনয়ারীবাদ। লেখার তারিখ ৭ই মাঘ, ১২৮৩ সাল।

সম্বোধন পড়েই ভির্মি খাবার জোগাড়। চম্পকলতিকা তাঁর প্রণয়ীকে বলেছেন—"প্রলয় গভীর নীর তরঙ্গ রঙ্গ বরেষু।" আজকালকার কোন প্রেমিক বা স্বামীকে এইভাবে আহ্বান জানালে মেয়েটির কপালে দুঃখ লেখা আছে। প্রেম তো চুলোয় যাবেই, মাথায় ডাণ্ডা পর্যন্ত পড়তে পারে।

যাই হোক, চম্পকলতিকার চিঠি এইরূপ ;—প্রলয় গভীর নীর তরঙ্গ রঙ্গ বরেষু॥

হে ভ্রষ্ট লম্পট শিরোমণি কপট শঠ চূড়ামণি যদি চ আমার মন অহর্নিশি তব দর্শন লালশায় লালায়িত কিন্তু অস্মদ সম্বন্ধে ভবদীয়

তাদৃশ অনুরাগ লক্ষিত হয় না॥

হায় আমি অবলা অখলা সরলা কুলবালা হইয়া বিষকুম্ভ পয়োমুখ পাষান হৃদয় ব্যক্তির করে সরল চিত্তে কায় মনো বাক্যে রূপ যৌবন মান প্রাণ সমুদয় সমর্পণ করিয়া বড়ই মূঢ়ের কার্য করিয়াছি আগে জানি না যে তুমি আমার নও তাহা হইলে প্রথম মিলন দিবসে বিশেষ বিবেচনা মত উচিত কার্য করিতে বাধ্য হইতাম, দেখ নায়কের মিলনবারি প্রত্যাশায় চাতকিনী নায়িকা স্বয়ং অভিষার পথ অবলম্বন করিয়া নায়ক সমীপে গমন করিলে তাহার প্রতি নায়কের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তৎ সমুদায় সবিস্তারে লিখিবেন আর দীনা হীনা খীনা মলীনা সহায়বিহীনা ললনার সহিত স্বয়ং সাখ্যাত না করিয়া অপর ব্যক্তির দ্বারা দুই তিনবার প্রকারান্তরে বঞ্চিত করা কি শুননায়কের সমুচিত কার্য হইয়াছে……॥

ছিয়াশী বছর আগেকার অখ্যাত বঙ্গললনা চম্পকলতিকাকে কেউ চেনে না। কিন্তু এই একখানা চিঠিতেই প্রণয়ীবিরহকাতর 'অবলা অখলা'-র খেদ চমৎকার ফুটে উঠেছে। রামগড় পাহাড়ের যোগী-মারা গুহায় খোদাই করা তিনটি ছত্র (শুতনুকা নাম দেবদস্থিকি তং কাময়িথ বালনশয়ে দেবদিন্নে নাম লূপদকখে) পড়ে আমরা যেমন জানতে পারি শত শত বছর আগেকার এক অপরিচিতা প্রণয়িনী সুতনুকা দেবদাসীর কথা,—যে বারাণসীর রূপদক্ষ শিল্পী দেবদত্তকে ভালবেসেছিল তেমনি পুরনোচিঠির তাড়া থেকে খুঁজে বের করা চম্পকলতিকার এই প্রণয়পত্রে এক গ্রাম্যকুলবালার ব্যক্তিগত জীবন ধরা পড়েছে। এই জীবনের ছবি সাহিত্যে নেই।

সে যুগের সমাজের মূল্যবান দলিল পুরনো চিঠি। আমাদের আসল ইতিহাস ঐ পুরনো চিঠিতেই লুকিয়ে আছে। বাংলা গদ্যের আদি নিদর্শনও কয়েকখানা চিঠি আর দলিল-দস্তাবেজ। আমাদের পূর্ব-পুরুষরা কোন্ ভাষায় কথা বলতেন, জানতে হলে একমাত্র অবলম্বন সেই চিঠিই। তার আদিমতম নিদর্শন ১৫৫৫

খ্রীষ্টাব্দে অহোমরাজ চুকাম্‌ফা স্বর্গদেবকে লেখা কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের পত্রের "তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে"— এই কয়টি ছত্রে চারশ বছর আগেকার মৌখিক বাংলা ভাষা স্থায়ীরূপ পেয়েছে।

চম্পকলতিকার প্রেমপত্র বিশ্বভারতী সংগ্রহের অন্যতম। তার প্রেমপাত্রের নাম অজ্ঞাত; কিন্তু জানা গেছে, তিনি প্রবাসী। আজ-কালকার বিরহিনীরা যে-ভাষায় চিঠি লিখে থাকেন, তার সঙ্গে এই চিঠির বিস্তর অমিল সন্দেহ নেই, তবে মোদ্দা কথাগুলোর তেমন বদল হয়েছে বলে মনে হয় না।

বাঁকাপথে চোরাই প্রেমের অনেক নজীরও পুরনো চিঠিতে রয়েছে। প্রেমিক বা প্রেমিকার নিজের লেখা কোন বিবরণ পাইনি, তবে তাদের গুরুজনদের বৃত্তান্ত দেখে গোটা ব্যাপারটা আন্দাজ করা যায়। যেমন বীরভূমের নানুর গ্রামের অটলবিহারী অধিকারীর চিঠি—

মহামহিম শ্রীযুত জগতদুর্লভ ন্যায়লঙ্কার বেবস্তাপক ভট্টাচার্য মহাশয় বরাবরেষু—লিখিতং শ্রীঅটলবেহারি অধিকারি—কস্য আত্ম-বিবরণ পত্র মিদং লিখনং কার্য্যাঞ্চাগে—

আমার কন্যা শ্রীমতী গরবিনী দেব্যা অল্পবয়স্কা অতি অজ্ঞান আমার মাতার সঙ্গে কলহ করিয়া ক্রোধ করিয়া আমার বাটির একজন কৃষাণ অন্ত্যজ ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া কোন স্থানান্তরে গমনক্রমে জাইতেছিলা পথমধ্যে আটক পড়িয়া বাঘাগুা গ্রামে আমার কুটুম্ব বাড়িতে ছিল সংবাদ পাইয়া বাটিকে আনাইয়াছি লোক জনরব হইবাতে কী জানি কোন পাপ হইয়া থাকে এই সন্দেহ অতএব আমি জনরব প্রযুক্ত সন্দিগ্ধ হইয়া আত্মবিবরণ লিখিলাম ইহাতে শাস্ত্রসম্মত যদি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় যথা শাস্ত্রে ব্যবস্থা দিতে আজ্ঞা হইবেক ইতি সন ১২৪৭ সাল—তারিখ ১৬ ভাদ্র—

অর্থাৎ পত্রলেখক নিজকন্যার পাপে প্রায়শ্চিত্তের বিধান প্রার্থনা করেছেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে। এই ধরনের "আত্মবিবরণ" প্রাচীন কালের রেওয়াজ। কোনপ্রকার পাপ ঘটলেই অবিলম্বে বিধান চাইতে হবে আত্মবিবরণী বা জবানবন্দী চিঠি মারফৎ। তার মধ্যে আবার প্রেম সংক্রান্ত "পাপ"-ই বেশী। আর একখানা চিঠি—

লিখিতং শ্রীসিদাম পাগল সাং দরিখিরপাই কস্য জবানবন্দি পত্র মিদং কার্যঞ্চ আগে আমার স্ত্রী বাড়ি থেকা এক দফা বাহির হইয়া গিয়াছিল পুনরায় বাড়িকে লইয়াছিলাম দুই চার মাস থাকিয়া পুনরায় বাহির হই গেল এবং আমিহ তাহাকে পরিত্যাগ করিলাম ইহার বেবস্তা শাস্ত্র অনুসারে জেমত হয় তাহা আজ্ঞা দিতে হইবেক ইহ অতি দরিদ্র—ইতি তাং ২৬ মাঘ—সন ১২২৬ সাল—

পুরনো চিঠিতে আরও অনেক রকমের মজার জিনিস পাওয়া যায়। এবং আগেই বলেছি, সে যুগের সমাজ, সে যুগের অর্থনীতি সম্পর্কে নানা নতুন তথ্য বেরিয়ে পড়ে। শিবরতন মিত্রের 'টাইপ্‌স্ অব আর্লি বেঙ্গলি প্রোজ' নামক বইয়ে কয়েকখানি মূল্যবান পুরনো চিঠি আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লেখা একখানি পড়ে জানা যায়, সে সময় বাংলা দেশে মানুষ বিক্রির রেওয়াজ ছিল। স্বল্পমূল্যে দাসদাসী কেনাবেচার নিদর্শন হচ্ছে এই চিঠি—

"আমি আপনা খুসরজ ও রসবাত পুরাকত আকাম বিনা ওজর ইতবারে তোমার পান হনে রেআজি তিন রূপায়া লৈয়া আমার বেটী যার উমর এগার বরিস তুবার স্থানে আকির খাস করিয়া দিলাম।" এবং এই চিঠিতে জানা গেল তিনি তাঁর এগার বছরের মেয়েকে মাত্র তিন টাকায় বেচে দিয়েছেন। আর একখানা চিঠি পড়েছি। এটি আত্মবিক্রয়ের।

"এগার রূপাইয়া পাইয়া স্বইচ্ছাপূর্বক আত্মবিক্রয় হইলাম। তোমার পুত্র-পৌত্র আদি ক্রেমে আমার পুত্র-পৌত্র আদি ক্রেমে গোলামি করিবে।"

মাত্র এগার টাকায় পুরুষানুক্রমে আত্মবিক্রয়! ভাবতে আশ্চর্য লাগে। তেমনি আশ্চর্য লাগে, সে যুগের টাকাকড়ির হিসেব দেখে। দু'শ বছর আগেকার—একখানা চিঠি, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'চিঠিপত্রে সমাজ পত্র' থেকে নেওয়া—

স্বস্তি সকল মঙ্গলালয়
শ্রীযুত পুরুষোত্তম বিদ্যালঙ্কার
বরাবরেষু—
লিখিতং শ্রীলালমোহন দেব শর্ম্মণঃ শুভ সম্বধনপত্র মিদং সন ১১৭৩ সাল আব্দে লিখনং কার্যঞ্চ আগে তোমার পুত্র শ্রীগুরুপ্রসাদ দেবশর্ম্মার আমার কন্যা শ্রীমতী দাম্নি দেবীর সহিত শুভ সম্বন্ধ নির্ণয় করিলাম তাহাতে তোমার কুল মর্যাদা পণ ১৪ তঙ্কা দিঞা লগ্নানুসারে শুভকার্য্য সমাপন করিব এতদর্থে শুভ সম্বন্ধপত্র দিল ইতি তাং ১১ তারিখ—

পণ—	১৪৲
জায়—	
দানসামগ্রি—	১১৲
বরযাত্র—	৩৲

পুনশ্চ ॥ কুলাচার্যের বিদায় তোমি করিবেন—

আর একখানি সাধারণ চিঠি। ১২৩৫ সালে লেখা।

সেবক শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মণ দণ্ডবৎ প্রণামা নিবেদনাঞ্চাগে

মহাশয়ের শ্রীচরণ কৃপাতে এজন সমস্ত মঙ্গল বিশেষ পরে নিবেদন মহাশয় যে অবধি মোকাম কলিকাতা গিয়েছিলেন সে অবধি কোন সমাচার পাই নাই, না পাইয়া উদ্বিগ্ন আছি মনুষ্য আগতে তথাকার মঙ্গলাদি সমাচার লিখিতে আজ্ঞা হইবেক পরং আমিহ মোকাম নাগাদ দশই তক মোকাম সহর জাইব এখানে বাটির খরচের অসঙ্গতি হইয়াছে এই লোক সমিভ্যারে চার পাচ সও টাকা

পাঠাইবেন পরে আমিহ মোকাম পহছিয়া নাগাদ আসার খরচ পাঠাইব আপনি নাগাদ বৈসাখে ২০ বিশা তক বাটী পেহছিকে পোহছিয়া শ্রীযুৎ গোপালচন্দ্র ভায়া জজ্ঞপবিতের দিবস নির্ণয় করিয়া আমাকে সমাচার লিখিবেন আমিহ সেই অনুসারে বাটী পোহছিব ইহা শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম ইতি—

আগেকার যুগে কীভাবে চিঠি লিখিতে হত, তার রীতিনীতিও অনেক পুরনো কাগজে বাৎলে দেওয়া হয়েছে। তু'শ বছর আগেকার এক দলিলে দেখতে পাচ্ছি লেখা আছে—

গ্রাম লিখিবার পূর্বে॥ সাকিম মৌজে কিম্বা মোকাম এই এক কথা লিখিবে॥ জেমন সাকিম কলিকাতা মৌজে কলিকাতা কিম্বা মোকাম কলিকাতা॥ আর আপনার গুরুর বাস জে গ্রামে সে গ্রামের নাম লিখিতে কিম্বা কহিতাগ্রে শ্রী ব্যবহার করিবে। জেমন শ্রীপাট খড়দহ॥

চিঠি লেখার ধারা কাব্যকারেও দেওয়া হয়েছে। যেমন—

পিতামহ মহাসয়ে
প্রণতি করিয়া।
তারে লিখি সেবকানু
সেবক বলিয়া॥
পিতা পিতৃব্য জেস্ট
ভ্রাতাদি সমতুল।
জেস্টম মধ্যম আর
শশুর মাতুল॥
জ্ঞাতি বন্ধু আদি করি
জত গুরুজন।
সেবক প্রণাম করি
লিখি নিবেদন॥

পুরনো কাগজপত্রে নানারকম ঘরোয়া খুঁটিনাটিও বেরিয়ে পড়ে। প্রায় দেড়শ বছর আগেকার এক চিঠির কোণে জনৈক নবজাতকের জন্মক্ষণের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমথুরামোহন ঘোষস্য প্রথম পুত্রের জাতহ ৭ শ্রাবণ—
আন্দাজী বেলা এক প্রহর থাকিতে ৮পা দক্ষিণধারী ঘর—
স্ত্রীলোক ছিল ১১ জনা—
বিধবা ৪ জনা—
সধবা ৭ জনা—
দক্ষিণ শিরা পুত্র জন্ম হইয়াছে—

১১৭০ সালের একটি বাজার খরচের তালিকাও ওই তাড়া থেকে পেয়েছি। ঠিক দু'শ বছর আগে বাংলাদেশে জিনিসপত্রের দাম কেমন ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যাবে। ইদানিং বাজারের জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্যে যাঁরা মাথা চাপড়ান, তাঁরা অতীত ইতিহাস রোমন্থন করে বর্তমানের প্রতি আরও বীতশ্রদ্ধ হবেন।

।সাদ্ধ—	/৫
পটল—৮	/৫
কচু—৮	৶০
আদা—১	৶০
কাঁচকলা—১০	।০
রম্ভা—১০	৶০
পাত—১০০	৶০
পান—১০০০	।৵৫
গুবাকু—৩	৸০
বার্তাকু—৪	৶০
ধুরুলি—১	১০
পাথ্যা—১	‹১০
মুড়ি—২	/০
	২৸/১৫
ধুতি—৫	২॥০
	৫।/১৫

বিশ্বভারতী পুঁথিশালার ৫৫২৪ নং চিঠিতে একটি বিয়ের গয়নার হিসেব পাওয়া যাচ্ছে। বিয়ের তারিখ ১২৯৫ সাল, পাত্র "শ্রীমান নৃসিংহলাল ঠাকুর বাবাজীবন।"

মাদুলী—১ থর	১৵০
কানমাকড়ি—২টি	২২॥০
বোলাক—১ খান	১১।০
মল—১ জোড়	১০॥০
কাকলী - ২ গাছা	১২৲
মরদানা—১ থড়া	৫৲
তাবিজ—১ জোড়	১০৲
	৭২।৵০

গয়নার স্বর্ণযুগ এই শতাব্দীর শেষার্ধেই শেষ। চৌদ্দ ক্যারেটের যুগের মহিলারা এই হিসেবটি পড়ে তাদের পূর্ববর্তিনীদের সম্পর্কে কিঞ্চিত ঈর্ষান্বিত হবেন।

বিয়ের গয়নার হিসেব মেলাতে গিয়ে একখানা চিঠি পেলাম যাতে পাত্র স্বয়ং তাঁর বিয়ের নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্রের ভাষায় সেযুগের সঙ্গে এযুগের বিশেষ পার্থক্য না হলেও নিজের বিয়ের চিঠি নিজের নামে বিলি করা একেবারেই হাল আমলের জিনিস। কিন্তু পুরনো একটি চিঠি সে ধারণা পাল্টে দিয়েছে। প্রায় নব্বই বছর আগে জনৈক শ্রীশিবচন্দ্র শর্মা লিখছেন

> বর্তনান বর্ষে ২১ বৈসাখ সোমবার আমার শুভবিবাহ হইবেক আপনারা কেঁওদার আলএ শুভাগমনপূর্বক শুভকার্য সমাধান করিবেন পত্র্যামন্তিতমিতি সন ১২৮২ তাং ১৯ বৈসাখ।

দীনেশচন্দ্র সেনের 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' এবং ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'প্রাচীন বাংলাপত্র সঙ্কলনে' অনেক মূল্যবান পুরনো চিঠি

ছাপা আছে.। তবে ব্যক্তিগত চিঠি কম, অধিকাংশই মামলা মোকদ্দমা, আইন আদালতের। তবে এই পত্রসাহিত্য থেকেই প্রাচীন বাংলার অভিজাত ও মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি কিছুটা পাওয়া যায়। তাছাড়া ছু'শ, আড়াইশ বছর আগেকার কয়েকটি চিঠিতে বিরামচিহ্ন বসিয়ে দিলেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের গদ্য বলে মনে হবে। যেমন ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্টের ফৌজদারকে লেখা চিঠি—"অল্প দিবস হয় আমি এথা আসিয়াছি, থানার কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এইদিগের থানা দৃঢ় করিয়া সেইদিগের থানাতে ফৌজ পাঠাইতেছি।" চিঠির ভাষার সাবলীলতা বিশেষ লক্ষণীয়।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে পুত্র গুরুদাসকে লেখা মহারাজ নন্দকুমারের একখানি চিঠি তুলে ধরি। এই ব্যক্তিগত পত্রে আন্তরিকতা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে—

> তোমার মঙ্গল সর্বদা বাসনা করণক অত্র কুশল। পরন্তু শ্রীযুক্ত মিস্তর মেদনটিন সাহেব ৯ই পৌষ সোমবার ছুই প্রহর দিবসকালে এখান হইতে রাহি হইয়াছেন। তাঁহার সহিত সকল কথোপকথন হইয়াছে তাহা কার্যদ্বারা বুঝিবে। তুমি কোন বিষয়ে অসন্তোষ করিবে না।

গোড়ার একখানা প্রেমপত্রে জনৈক চম্পকলতিকা দাসীর প্রিয়জন সম্বোধনের একটি নিদর্শন দেয়েছি। সেকালের রাজারাজড়া ও নবাব বাহাছুরদের কীভাবে সম্বোধন করা হত, জানলে চম্পক-লতিকাকে নিতান্ত আধুনিকা মনে হবে। একটি উদাহরণ দিই—

> স্বস্তি প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজভুজ বলে প্রতাপতাপিত শত্রুসমূহ পূজিতাখিল রাজেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীর খাস মজুর সুলতানন ও ইঙ্গলিস্থান জব্দয়েন বুনিয়ান আজিমঃসান শীপাহছালার আফু আজ বাদশাহী ও কম্পানী কেশওরে হিন্দোস্তান গৌরনর চারলছ লাট করনওলেছ বাহাদোর

বিসম সমরাট বৈরীজন করীকুম্ভ বিদারণ কেশরীবর মহোগ্র-
প্রতাপেষু……।

সে যুগের অনেক চিঠিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে "গোব্রাহ্মণ প্রতিপালক" বলে সম্বোধন করা হত। আবার ইংরেজ কর্মচারীরা দেশী লোকদের বাংলাতেই চিঠি দিতেন এবং চিঠির শিরোভাগে লিখতেন "শ্রীকৃষ্ণ।"

এই সব পুরনো চিঠি যদি নিঃশেষ হয়ে যেত, তাহলে এত তথ্য আমরা হয়ত জানতেই পারতাম না।

প্রত্যেক বাঙালী বাড়িতেই অল্পবিস্তর নানারকম পুরনো চিঠি হিসাবপত্র ছিল ; তার প্রায় সবই আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

তবে পুরনো যদি না-ই থাকে, নতুন চিঠিই এখন জমানো যেতে পারে। একদিন তা-ই কাজে লাগবে, তাই হবে ইতিহাস।

পঞ্চাশ বৎসরের তরুণ

উনত্রিশে ফাল্গুন, ১৩২৮ সাল, ইংরেজি ১৩ মার্চ, ১৯২২, দোল পূর্ণিমা। কলকাতার রাস্তায় বের হল নতুন একখানা বাংলা দৈনিক, আগাগোড়া লাল রঙে ছাপা, ভিতরে গান্ধীজীর ছবি। ক্যাপশন "মহাত্মা গান্ধী কারাগারে।" লাল রঙ দেখে সাহেবপাড়ার ভয়, না জানি কোন্ নতুন বিপদ-সংকেত। ইংলিশম্যান একদিন পর লিখলেন —A new Bengali daily made its appearence yesterday from Bagbazar, coloured like a danger signal. স্টেটস্‌ম্যানের প্রায় একই সুর—A new vernacular named Ananda Bazar appeared yesterday. A peculiar feature of the journal is that it is printed in red paper.

এ বিষয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার পরবর্তী মন্তব্য : স্টেটস্‌ম্যান আনন্দবাজারের বিশেষত্ব সম্বন্ধে লাল রঙের বিষয় ইঙ্গিত করিয়াছেন। গতকল্য দোলের দিন বলিয়াই আমাদের কাগজের রং লাল করা হইয়াছিল ; নতুবা লাল রঙে কাগজ বাহির করিবার কোন রাজনৈতিক মতলব নাই। ইংলিশম্যান কিন্তু আমাদের আনন্দবাজারকে danger signal বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইংলিশম্যান দেখিতেছি সোজাসুজি মনের ভয়টা ব্যক্ত করিয়াছেন। লাল রং দেখিয়া ষাঁড় ক্ষেপিয়া উঠে, ইংলিশম্যান ক্ষেপিলেন কেন?…ইংলিশম্যানের বাগবাজার প্রীতি এত প্রবল যে তিনি সর্বত্রই বাগবাজার দেখেন। বাগবাজার ছাড়াও কলিকাতায় স্থান আছে। ইংলিশম্যান জানিয়া রাখুন যে আমরা গোলদীঘির ধারে আড্ডা গাড়িয়াছি।

ভয় ছিল শুধু সাহেব পাড়াতেই এবং সেটা স্বাভাবিক। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকেই সম্পাদকীয়

ও সংবাদ পরিবেশনায় স্বাধীনতার মন্ত্রে দেশবাসীকে দীক্ষিত করার ব্রত আনন্দবাজার নিয়েছিল। তাই প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মিলেছিল অপূর্ব সাড়া আর অভিনন্দন। স্বদেশী দৈনিক দি সারভেণ্ট্ লেখেন: Ananda Bazar Patrika is a new Bengali daily, pledged it seems, to support Mahatmaji. Therefore it has been, we are afraid, spoken of as a danger signal by the Englishman. We assure our young contemporary that the Englishman's compliments really a promising introduction for its useful career. ওই একই সময়ে 'প্রভাকর'-এর মন্তব্য: আমরা দেখিয়া স্থখী হইলাম যে, দোল-পূর্ণিমার দিন হইতে নূতন দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা বাহির হইতেছে। দোলপূর্ণিমা, তাই বোধহয় ফাগের রংয়ে রঞ্জিত হইয়া প্রথম সংখ্যা বাহির হইয়াছে। আমরা সানন্দে এই নূতন সহযোগীর অভ্যর্থনা করিতেছি।

প্রথম বর্ষের প্রথম কয়েকটি সংখ্যা আনন্দবাজারেই ওই আতঙ্ক ও অভিনন্দন ছাপা হয়েছিল। আনন্দবাজার তখন প্রকাশ হত ৭১/১, নং মির্জাপুর স্ট্রীট থেকে। সম্পাদক ছিলেন প্রফুল্লকুমার সরকার, যদিও গোড়ায় তাঁর নাম ছাপা হয়নি। শেষ পৃষ্ঠার তলায় শুধু লেখা থাকত "৭১/১ নং মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে শ্রীঅধরচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।"

প্রথম পাতার ঊর্ধ্বাংশে আনন্দবাজার পত্রিকা'র দুপাশে লেখা ছিল সাময়িক বিজ্ঞাপনের হার এবং কাগজের মূল্যের হার। তখন বিজ্ঞাপনের হার ছিল—একদিনের (প্রতি লাইন) ছয় আনা, একদিনের (প্রতি ইঞ্চি) দু টাকা চার আনা, তিনদিনের (প্রতি লাইন) চার আনা, তিনদিনের (প্রতি ইঞ্চি) দেড় টাকা, ছয়দিনের (প্রতি লাইন) তিন আনা এবং ছয়দিনের (প্রতি ইঞ্চি) এক টাকা তিন

আনা। কাগজের "নগদ মূল্য দুই পয়সা" এবং "বার্ষিক (অগ্রিম দেয়) শহর দশ টাকা, মফস্বল সাড়ে বারো টাকা।" শিরোনামেরও শীর্ষে লেখা "টেলিফোন নং ২৩৫ (বড়বাজার)।"

সাত কলমে ভাগ করা চার পৃষ্ঠার কাগজ প্রথম পাতায় বিজ্ঞাপন, নানা কোম্পানির। শেষ পাতায় প্রথম কয়েকদিন ফুলপেজ—একটি আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠানের। নাম "বৈদ্যনাথ আয়ুর্বেদ ভৈষজালয়, ৫৬ ও ৬২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, প্রতিষ্ঠাতা স্বধর্মনিষ্ঠ স্বর্গীয় হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।" তৎসহ মুখুজ্জে মশায়ের ডবল কলাম ছবি।

প্রথম পাতার বিজ্ঞাপন প্রকাশের প্রথম সপ্তাহে মোটামুটি এক। সতীশ কবিরাজের হাঁপানির যম 'শ্বাসারি', শিশি ১৷৷০, ডজন ১৬৲, মাশুল পৃথক, ৩ দাগে শান্তি। 'কার এণ্ড মহলানবীশের গ্রামোফোন ও খেলার সরঞ্জাম, বাঘ মার্কা রসগোল্লা, দেশীয় উদ্ভিজ উপাদানে প্রস্তুত জ্বরের শনি 'গান্ধী সুধা' (Regd.), ঢাকা শক্তি ঔষধালয়, আর গেভিন এণ্ড কোং কলিকাতার 'জারমলীন' জ্বরের যম, কম্বলালয়ের অকৃত্রিম খদ্দর, বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোম্পানি লিমিটেড, কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'শিবাজী গুরু রামদাস স্বামী' গ্রন্থ, উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী, মিহিজামের পি. ব্যানার্জির গলিত কুষ্ঠ ও ধবলের ঔষধ, বিনামূল্যে রায়সাহেব ডাঃ কে, সি, দাসের কামবিজ্ঞান, রাণাঘাট কেমিকেল ওয়ার্কসের তৈরি "সর্ববিধ" স্নায়বিক দৌর্বল্যের অমোঘ ও অদ্বিতীয় মহৌষধ 'রেজীনাস', একশিরা ও কুরণ্ড রোগের দৈবশক্তি সম্পন্ন মহৌষধ সহাবস্থান করেছে।

'চিত্রপট' নামক গ্রন্থের প্রণেত্রী হচ্ছেন শ্রীমতী সরলাবালা দাসী। "শ্রীমতী সরলাবালা সাহিত্য জগতে সুপরিচিত। বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা সমুহে প্রকাশিত কয়েকটি উৎকৃষ্ট গল্প এই 'চিত্রপটে' স্থান পাইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।"

তাছাড়া আছে—"স্কটিশ চার্চ কলেজের ভূতপূর্ব রসায়ন অধ্যাপক

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ মহোদয়ের আবিষ্কার, অম্ল, অজীর্ণ, উদরাময়, বুকজ্বালা, শ্বেত ও রক্ত আমাশয়, ডিসপেপসিয়া, কলেরা প্রভৃতি যাবতীয় উদরপীড়ার অব্যর্থ ও অমোঘ—'লাইমো ডাইন।' মূল্য ১৲ টাকা, সর্বত্র পাওয়া যায়। দি নিউ এরা কেমিক্যাল ওয়ার্কস, ১৫৫, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।"

ওই ক্ষীরোদপ্রসাদেরই নাটক রঘুবীরের ফুলপেজ বিজ্ঞাপন অন্যদিন—"বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোং, কর্ণওয়ালিস রঙ্গমঞ্চে, ডিরেকসন ম্যাডান থিয়েটার লিমিটেড, রঘুবীরের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ি।" উপরন্তু জ্ঞাতার্থে নিবেদন—"আসন পূর্বাহ্নে রিজার্ভ করা যায়।"

থিয়েটারের মত সিনেমার (ফটোনাট্যের) বিজ্ঞাপনও রয়েছে। যেমন—

রসা থিয়েটার, ভবানীপুর

অদ্য শেষ অভিনয়

সন্ধ্যা ৬টা ও ৯৷৷টা

আপনি কি আপনার বংশ গৌরবে গৌরব বোধ করেন? আপনি কি প্রেমের খাতিরে বংশ গৌরব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত? তাহা হইলে সুন্দরী মরী ম্যাকলায়েনের অভিনয় দেখুন—

চমৎকার প্রেমমূলক ফটোনাট্য

সেভিং দি ফ্যামিলী নেম

৫টি প্রকাণ্ড রীলে সম্পূর্ণ

ইহার আখ্যান বস্তু এই—একটি অভিজাত বংশীয় যুবক একটি নর্তকীর প্রেমে পড়িয়া যায়, কিন্তু বংশ গৌরবের খাতিরে যুবক আত্মবলি দেয়।

তাহার কাজটা কি ভাল হইয়াছিল? এই প্রশ্নের উত্তর এই হৃদয়স্পন্দনকারী নাটকে পাইবেন। নাট্যাকারে মহামূল্য উপদেশ। এবং অন্যান্য আকর্ষণ।

ইকুইটেবল ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের বিজ্ঞাপনের ভাষা ও বক্তব্য উল্লেখযোগ্য ঃ—"ইহাই প্রকৃত অসহযোগ। যে সমস্ত ভকীল উকীল অধ্যাপক শিক্ষক ও গ্র্যাজুয়েটগণ মাতৃভূমির সেবার জন্য কংগ্রেস প্রস্তাব অনুসারে স্ব স্ব কার্য ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা এই কোম্পানীর উন্নতি বিধানে চেষ্টা করিয়া দেশ মাতৃকার সেবা ও জীবিকা নির্বাহের উপায় বিধান করুন। কোম্পানীর কাগজপত্রে দেখা যায় যে, এই কোম্পানীর অনেক কর্মী বেতন ও কমিশন হিসাবে মাসিক ৫০৲ টাকা হইতে ২০০০৲ টাকা উপার্জন করিতেছেন। আমরা সর্বসাধারণকে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

প্রথম পাতার বিজ্ঞাপন থেকে আরও জানতে পারি থার্মোমিটারের দাম "১টি ১৷৷০ টাকা, ডজন ১৬৲ টাকা" এবং রয়াল স্ট্যাণ্ডার্ড সাইকেলের দাম ১৪০৲ টাকা ও র‍্যালে ২৩৫৲ টাকা।—বিজ্ঞাপনদাতা দি ইউনাইটেড সাইকেল কোং, ৭৫, হ্যারিসন রোড।

'স্বরাজ গোলক ধাম' নামক নতুন ধরনের ক্রীড়ার বিজ্ঞাপনদাতা শ্রীবটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠিকানা ১৩ নং রাধানাথ মল্লিক লেন। তিনি জানাচ্ছেন—"নূতন ধরনের নির্দোষ শিক্ষাপ্রদ আনন্দদায়ক ও চিত্তাকর্ষক খেলা। বালকেরা একবার পাইলে আর অন্য কিছু চাহিবে না। মূল্য এক আনা মাত্র। ছয় পয়সার ডাকটিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান যায়।"

এ তো গেল বিজ্ঞাপনের দিক, যা থেকে আমরা পাই পঞ্চাশ বছর আগেকার একটা চিত্র, কিন্তু "নূতন দৈনিকের" আসল গুরুত্ব সম্পাদকীয় ও সংবাদে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলমের প্রথমের লেখা —"শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ," তারপরেই 'আগে চল আগে চল ভাই/ পড়ে থাকা পিছে/মরে থাকা মিছে/বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।" কবিতার পরেই দিনপঞ্জী ঃ সোমবার ২৯শে ফাল্গুন, ১৩২৮ সাল, ইং ১৩ই মার্চ মুং ১৩ই রজ্জব ইত্যাদি। তলায় লেখা "বন্দেমাতরম্, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯শে ফাল্গুন সোমবার সন ১৩২৮ সাল।"

সম্পাদকীয় প্রবন্ধ শুরু তারপরেই। গোড়ার দিকে অধিকাংশই মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় চারটি—ফাল্গুনী পূর্ণিমা, দোল, মহাত্মা গ্রেপ্তার ও দেশবন্ধুর স্বাস্থ্য। যৎকিঞ্চিৎ শুরু দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে।' দ্বিতীয় দিনের সম্পাদকীয়ের শুরু এইভাবে—

"মহাত্মা গান্ধী আজ কারাগারে। তাঁহার নিজের ভাষায় বহু-দিনের কর্মক্লান্তির পরে আজ তিনি বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিয়াছেন।" যৎকিঞ্চিৎ যে কটি প্রথম কয়দিন রয়েছে, তার প্রায় সবই গান্ধীজী সম্পর্কে।

সংবাদগুলো দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠায় ছড়ানো—ছোট ছোট অক্ষরে উপ-শিরোনামা দিয়ে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার উপরে দু' কলাম জায়গা জুড়ে ছড়ানো সব খবরের চুম্বক বড় বড় অক্ষরে এক সঙ্গে বক্স করে দেওয়া। যেমন দ্বিতীয় সংখ্যায় আছে—

মহাত্মার বিচার
সেশনে সোপর্দ
দক্ষিণ আফ্রিকায় ভীষণ বিদ্রোহ
ঐক্য আন্দোলনে পুলিশের গুলি
বড়লাটের বক্তৃতা
দেশবন্ধুর স্বাস্থ্য
মিঃ মণ্টেগুর আত্মসমর্পণ
ভীল হাঙ্গামা
সুরাট কালেক্টরের পদত্যাগ

তৃতীয় পৃষ্ঠায় অন্যান্য খবরের সঙ্গে বিশেষ লেখা দুটি—একটি গান্ধীজীর প্রবন্ধ 'যদি আমি গ্রেপ্তার হই' এবং অন্যটির নাম ছুঁৎমার্গ —যার প্রতিপাদ্য বিষয়···"বৌদ্ধযুগের পর আর্য-অনার্যের মিলন মিশ্রণ আশঙ্কা করিয়া সমাজ শরীরকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য সেদিন যে-সব কঠোর বিধির প্রচলন হইয়াছিল, অনাবশ্যক বলিয়া তাহার অনেকগুলিই পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে, যাহা আছে—

তাহারই বিকৃত রূপ—ছুঁৎমার্গ।”

প্রথম দু তিন দিনের খবর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশী বিদেশী, শহরের, গ্রামের, বাংলার, বাংলার বাইরের নানারকম খবরই রয়েছে। যেমন লণ্ডনে তুরস্কের পররাষ্ট্রসচিব ইজ্জত পাশা, আগ্রায় বড় লাটের সফর, রাজপুতানায় ভীল হাঙ্গামায় ২০ জন নিহত, শ্রীগৌরীর (শ্রীহট্ট) প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুক্ত সনৎকুমার দত্তচৌধুরী ১৪৩ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার, ইত্যাদি।

কলকাতা শহরের নানা খবর রয়েছে ‘ঘরে বাইরে’ নামক আলাদা বিভাগে। তার দু একটি নমুনা—

“কলিকাতায় কলেরা ও বসন্ত রোগের প্রকোপ ধীরে ধীরে বাড়িতেছে। ক্যাম্বেল হাসপাতালে প্রত্যহ ৮।১০টি করিয়া নূতন বসন্ত রোগী গৃহীত হইতেছে।”

“গতকল্য বড়বাজারে হোলী খেলিতে গিয়া প্রায় ৫০ জন মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাদেব অপরাধ, তাঁহারা পথিকদের গায়ে রং ও আবীর দিয়াছিলেন।”

“গতকল্য রাত্রে ইডেন গার্ডেন রোডে একখানি প্রথম শ্রেণীর ফিটন মোটর গাড়ীর সংঘর্ষে অত্যন্ত জখম হইয়াছে। ফিটনের আরোহী একজন ইউরোপীয় মহিলা বিশেষ আঘাত পাইয়াছেন। মোটর গাড়ীর চালক গাড়ী লইয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু উহার নম্বর লক্ষ্য করিয়া রাখা হইয়াছে।”

“হাওড়া পুলের নিকট একজন বাঙ্গালী মোটরের ধাক্কা খাইয়া গুরুতররূপে আহত হইয়াছে—তাহাকে ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টার মিঃ ভিনার তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে পাঠাইয়া দেন।”

শেষোক্ত সংবাদে বিশেষ দ্রষ্টব্য ‘বাঙ্গালী’র আহত হওয়া। দু-

একটি শিরোনামাও আধুনিক। —"লর্ড সিংহ মহাশয় বর্তমান মাসের শেষভাগে শিলং রওয়ানা হইবেন"—এই সংবাদের শিরোনামা 'সিংহ-সংবাদ।' মাঝে মাঝে কারটুনও দেওয়া হয়েছে দু একটি। বলা নিষ্প্রয়োজন, বিষয় রাজনীতি। সংবাদ রচনার মধ্যেও অভিনবত্ব ছিল। শোক সংবাদের একটি নমুনা দিই।

পরলোকে জীবেন্দ্র দত্ত

চট্টলভূমির বন-উপবন যে সুমধুর পিকধ্বনীতে গত দশ বৎসর যাবৎ মুখরিত হইতেছিল, সেই জীবেন্দ্র কুমার দত্ত মহাশয় আর ইহজগতে নাই। গত ১২ই তারিখে রাত্র দুই ঘটিকার সময় জন্মভূমি ঘাটফরাদে তিনি মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি গিয়াছেন, কিন্তু যতদিন বাঙ্গালী থাকিবে, ততদিন বাঙ্গালার কাব্য-জগতে তাঁহার 'তপোবন' প্রভৃতি রত্নরাজি জাজ্জ্বল্যমান থাকিবে। কবি তাঁহার অল্পবয়স্কা স্ত্রী ও একটি কন্যা-মাত্র রাখিয়া গিয়াছেন। ভগবান তাঁহাদের শান্তি প্রদান করুন আমরা ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

একালের সংবাদবিশারদরা যাই বলুন, কাঠখোট্টা খবুরে ভাষার চেয়ে এই সমন্তব্য সংবাদ পাঠকের কাছে অনেক বেশি অন্তরঙ্গ। অন্যভাবে, অন্য চেহারায়, অন্য ভঙ্গিতে সেই অন্তরঙ্গতার ধারা অবশ্য আজও প্রবহমান।

শুভঙ্করের আর্যা

এমন একদিন ছিল, যখন বাংলা দেশে অপ্রতিহত প্রতাপ ছিল দুটি ব্যক্তির—খনা আর শুভঙ্করের। ইদানিং এঁদের সৌভাগ্য-সূর্য অস্তমিত। সারের কারখানা ও জাপানীপ্রথার চাষ যেমন খনার বচনের অপেক্ষা করে না, তেমনি টাকা-নয়াপয়সা, কিলোগ্রাম-মিলিগ্রামের সঙ্গে শুভঙ্করের আর্যার সম্পর্ক আদৌ নেই। আজকালকার শিশু তাদের চিন্তাধারা থেকে এঁদের দু-জনকে বিসর্জন দিয়েছে।

অথচ আমরা, যারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হতেই শৈশবকে বিদায় দিয়েছি, যারা কে-জি স্কুলে বসে নার্সারি-রাইম শোনার বা ডট্-পেনে ('ফুট-কলম' শব্দটি বাংলায় চালু করলে কেমন হয়?) সুকুমার রায়ের ছড়া স্মৃতি থেকে লেখার সুযোগ পাইনি, তাদের কাছে একদিন পাঠশালা, শ্রুতলিপি, মানসাঙ্কের মত ধ্রুবসত্য ছিল ওই খনার বচন আর শুভঙ্করের আর্যা। বিশেষ করে দ্বিতীয়টি। দুরূহ গণিত-সমস্যার জাল ছিন্ন করতে শুভঙ্কর ছাড়া আমাদের গতি ছিল না।

এখন যারা স্কুলে যেতে শুরু করেছে, তারা বোধহয় শুভঙ্করের নামও শোনেনি। নয়াপয়সা আর কিলোগ্রাম শুভঙ্করকে চিরকালের মত নাকচ করে দিয়েছে। মণ সের আনা-পাইয়ের মত তিনিও অচল। পুরনো, নতুন—দুটোকে আঁকড়ে আমরা দো-আঁশলা বনে আছি, মাইল-আনা-সের-গ্যালন এখনও আমাদের কাছে নিরর্থক নয়, কিন্তু স্পুৎনিক যুগের শিশুদের দৃষ্টিতে মিটার-লিটার গ্রাম-নয়াপয়সা একমেব সত্য।

সম্পূর্ণ বিস্মৃত হবার আগে একদা-প্রতাপী, হৃত-গৌরব শুভঙ্করের উদ্দেশ্যে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন বোধহয় দরকার। কিন্তু মুশকিল

শুরুতেই। এত পরিচিত হয়েও তাঁর সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। মণকরা হিসাবে আড়াই সের জিনিসের দর বের করতে যাঁরা চট করে শুভঙ্করের 'মণ প্রতি যত টঙ্কা হইবেক দর' ছড়াটি আওড়ে যত টাকা তত আনা ধরে আড়াই সেরের মুশকিল-আসান করেন, তাঁরাও ঠিক বলতে পারেন না, এই উপকারী পদ্যটির রচয়িতার পদবী কী, নিবাস কোথায়, কোন্ শতাব্দীর লোক তিনি। শুভঙ্কর নামটি পরিচিত, কিন্তু তাঁর জীবন আমাদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত।

এমন কি সত্যি সত্যি শুভঙ্কর নামে কেউ ছিলেন কিনা, তা নিয়েও গবেষকরা মাথা ঘামিয়েছেন। শ্রীসুকুমার সেনের অভিমত, থাকলে তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর আগেকার লোক। পদবী নিয়েও অনুসন্ধানীরা দ্বিধাগ্রস্ত। কেউ বলেন 'সেন', কেউ বলেন 'দাস'। তবে কায়স্থ হওয়াই সম্ভব, শুভঙ্করের নামে আসামে যে-সব গণিতের ছড়া চলে, তা 'কায়থলি আর্যা' নামে পরিচিত। এবং এঁরাই নাকি সেকালে ছিলেন গণিতে অধিক পারদর্শী।

বলা নিষ্প্রয়োজন, শুভঙ্কর বাঙালী ছিলেন এবং সম্ভবত প্রাচীন মল্লভূমের (বাঁকুড়া) লোক। তাঁর ছড়া বাংলা এবং আসামেই বেশী চালু। শুভঙ্করের প্রাচীনত্বের প্রমাণ তার সুপরিচিত আর্যাটি—

কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে,
কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে।

এই পঙক্তি দুটোর সঙ্গে প্রাচীন অপভ্রংশ ভাষার দারুণ মিল। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকে সঙ্কলিত হল অপভ্রংশে রচিত অনেকগুলো কবিতা। এই সঙ্কলনের নাম প্রাকৃতপৈঙ্গল। বাংলা দেশে এই বইটির কদর ছিল, এবং কিছু কবিতার রচয়িতা বাঙালী। শুভঙ্করের আর্যার সঙ্গে 'প্রাকৃতপৈঙ্গলে'র অনেক কবিতার মিল রয়েছে। যেমন শুভঙ্কর লিখেছেন—

পণ শশী পঞ্চম শর গজ বাণ।
নবহু নবগ্রহ রস বসু মান॥
অষ্টাদশ পণ বুড্‌ডহু দিজ্জে।
আজু বিষম খড়ি দিবহু কিজ্জে॥

তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে 'প্রাকৃত-পৈঙ্গলের' এই কবিতা—

শির তঙ্কে তসু সিরপর ওঙ্কে।
উবরল কোট্টা পুরহ নিসঙ্কে॥
মত্তানেরু অঙ্ক সঞ্চারি।
বুজ্‌ঝহ বুজ্‌ঝহ জন দুই চারি॥

তাছাড়া আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত। শুভঙ্করের অঙ্কের ছড়াকে বলা হয় 'আর্যা'। এই 'আর্যা' হচ্ছে প্রাকৃত কবিতাবলীর অন্যতম ছন্দের নাম। সংস্কৃতে এবং প্রাকৃত ভাষায় এই ধরনের গণিতসূত্র আর্যা ছন্দে রচিত হয়েছে।

শুভঙ্করের প্রাচীনত্বের আর একটি প্রমাণ 'সদুক্তি কর্ণামৃত'। দ্বাদশ শতাব্দীতে সঙ্কলিত হয় কিছু সংস্কৃত কবিতা। তারই অন্যতম 'সদুক্তি কর্ণামৃত'। আর একটি 'কবীন্দ্র বচন সমুচ্চয়'। 'কোহহয় দ্বারি হরি' শীর্ষক একটি সংস্কৃত শ্লোক ওই দুই সঙ্কলনগ্রন্থেই রয়েছে। 'কবীন্দ্র বচন সমুচ্চয়ে' রচয়িতার নাম নেই, কিন্তু 'সদুক্তি কর্ণামৃতে' ভণিতা আছে শুভঙ্করের।

ইনি কোন্ শুভঙ্কর? সম্ভবত আমাদের আলোচ্য শুভঙ্করই। কেননা তাঁর লেখা কয়েকটি আর্যার ভাষা প্রাচীনত্ব ঘোষণা করে এবং 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে'র ভাষার সঙ্গে মিল দেখে আমরা অনুমান করতে পারি, তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর বা তার আগেকার লোক।

তবে একথাও বলা যায়, বর্তমানে প্রচলিত শুভঙ্কর আর্যার সব কটি একজনের রচনা নয়। 'কুড়বা কুড়বা'-র সঙ্গে যদি তুলনা করি তাঁর নামে চালু আর একটি ছড়া—

"মণের দামের বামে ইলেক মাত্র দিলে,
আধ পোয়ার দাম ভাই নিমেষেতে মিলে"।

তাহলে দেখব দুটিতে ভাষাগত মিল কম। দ্বিতীয়টি নিশ্চয়ই অর্বাচীন। সম্ভবত পরবর্তীকালে একাধিক অখ্যাত গণিতজ্ঞ-কবি নিজেদের লেখা শাশ্বত করার বাসনায় শুভঙ্করের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। ঠিক একই জিনিস যেমন ঘটেছে পদাবলী রচয়িতা চণ্ডীদাসের বেলায়।

শুভঙ্করের ভণিতাযুক্ত অনেক প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায়। তাছাড়া একই নামে দেখা যায়, আর একখানা পুঁথি—'কাগজসার'। রচনা অর্বাচীন, তবে সূচনা মজার। শুরুতে লেখা আছে—

শ্রীকৃষ্ণ চরাণাম্ভোজ প্রণম্য পরয়া মূদা
ঋজু কাগজসারোহয়ং চিত্রগুপ্তযথোদিতম।

শ্রীসুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ডে ওই শ্লোকটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, সেকালের গণিতবিশারদরা কায়স্থ বলে উল্লিখিত হতেন। পরলোকের অ্যাকাউটেণ্ট-জেনারেল এবং অডিটার-জেনারেল চিত্রগুপ্ত। সুতরাং চিত্রগুপ্ত যমের দুয়ারে মহাকায়স্থ। মুসলমান অধিকারের সময় 'কায়স্থ' শব্দটি জাতির নামে পরিচিত হয়ে গেছে বটে, কিন্তু হিসেবের কাজ তখন তাঁদের একচেটিয়া। সেইজন্যে আর্যা রচয়িতারা সকলে কায়স্থ না হয়েও ছড়ায় প্রায়ই পড়ুয়া কায়স্থ সন্তানকে উদ্দেশ করেছেন।

শুভঙ্কর ছাড়া আরও বহু আর্যা-রচয়িতার পুঁথি পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে সুপরিচিত ভৃগুরাম দাস ও রামদুলাল রায়। রামদুলালের বাড়ি ছিল বর্ধমানের বাঁশা গ্রামে। রামদুলালের একটি লেখার সেকালে, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের পাঠশালায় গণিত-শাস্ত্র অধ্যয়নের একটি সুন্দর ছবি রয়েছে—

অষ্টাদশ ছাওয়াল পড়িছে নিরন্তর,
অষ্টশব্দী আদি করি পড়িল অমর।

বিবিধ প্রকারে অঙ্ক শিখিয়াছে সভে,
অষ্টকোঠা অষ্টপর শিক্ষা করাইবে।
সরকার বেড়িয়া সভে বস্থে ডানি বাঁ,
অধ্যয়ন করাইছে সুখিরাম খাঁ।
তিলির নন্দন আর নারাঙ্গিতে বাস,
কঠিন কঠিন অঙ্ক করিছে প্রকাশ।
শ্রীরামদুলাল দ্বিজ কবি ছান্দে কয়,
অঙ্ক হল্যে অস্থির সুস্থির কর্‍্যা লয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেও এই চিত্রটি বাংলা দেশের গ্রাম-জীবনে সত্য ছিল। আর এখন? সে পাঠশালা নেই, সে গুরুমশায়ও নেই এবং 'হায়রে কবে কেটে গেছে শুভঙ্করের কাল।'

সিলেটী নাগরী

একদা জনপ্রিয় এবং অধুনা অখ্যাত একটি বর্ণলিপির নাম 'সিলেটী নাগরী'। ব্রাহ্মী নয়, খরোষ্ঠী নয়, এই লিপি সেদিনও একটি জীবন্ত ভাষার বাহন ছিল। ভাষাটির নাম বাংলা। মণিপুরী ভাষার বাহন বঙ্গলিপি এবং অসমীয়া লিপির সঙ্গে তার মিল প্রায় ষোল আনা, কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না, পূর্ববঙ্গের সুদূর প্রান্তের সুদূরতম পল্লীতে ওই সিলেটী নাগরী শত সহস্র অল্প শিক্ষিতের মধ্যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দুয়ার খুলে দিয়েছিল।

এই লিপির ব্যবহার অবশ্য সিলেটের মুসলমান সমাজের মধ্যেই মোটামুটি সীমাবদ্ধ ছিল। আর কিছুটা ছিল ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ, ত্রিপুরার ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং কাছাড় জেলায়। ইদানীং সিলেটী নাগরীর প্রচলন নেই বললেও চলে, তবে একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। এখনও দু'একটি ছাপাখানায় সিলেট নাগরীতে ছাপা বাংলা বই বাজারে বের হয়, যদিও তার কদর আগেকার মত নেই।

পশ্চিম থেকে বেশ কিছু মুসলমান মধ্যযুগের নানা সময়ে সিলেট অঞ্চলে এসে আশ্রয় নেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে আরব দেশের ইয়েমেন রাজ্যের দরবেশ শাহজলাল ৩৬০ জন খানদানী মুসলমান আউলিয়া নিয়ে সিলেটে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেন। শাহাজ-লালের মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে বহু পশ্চিমা মুসলমান পরে দীর্ঘকাল ধরে সিলেটে এসে স্থায়ী বাসিন্দা হন। তাছাড়া ষোড়শ শতাব্দীতে আফগানরা মোগলদের তাড়া খেয়ে বিপুল সংখ্যায় সিলেটে আশ্রয় নেন। এঁরা ধীরে ধীরে স্থানীয় বাঙালী সমাজের সঙ্গে, বিশেষ করে নবদীক্ষিত মুসলমানদের সঙ্গে সামাজিকভাবে মিশে যান কিন্তু স্থানীয় বঙ্গভাষা মুখে মুখে আয়ত্ত করা সত্ত্বেও লেখ্য সাধু

ভাষার সঙ্গে পরিচয় লাভ করা ওদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। একে তো সিলেটের কথ্য ভাষা বঙ্গ সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল কলকাতার ভাষা থেকে পৃথক, তদুপরি গোড়াকার পণ্ডিতী গদ্যে সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ ওই সব 'নতুন বাঙালী' মুসলমানদের সহজসাধ্য নতুন লিপি প্রণয়নের প্রয়োজন বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া ফারসির চর্চা যখন কমে গেল, আর রাজকার্যের ভাষা রইল না, এবং বাংলা লিপির জটিলতা আয়ত্তে আনাও সহজ হল না, তখন ওইসব মুসলমানেরা বাধ্য হয়েই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে কিংবা উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় নিজস্ব ওই কৃত্রিম লিপি সৃষ্টি করেন। তার মূল উপাদান হিসাবে রইল বাংলা, দেবনাগরী ও কায়থা লিপি। এই লিপি হল বাংলা লিপির চেয়ে অনেক সরল ও সহজ যার ফলে গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে মুসলমান মেয়েদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা বেড়ে গেল তৎক্ষণাৎ। লেখা হতে লাগল একের পর এক ইসলামী সাহিত্য—নামাজ রোজা ইত্যাদি পালনের বিবরণ, আউলিয়াদের জীবনী, প্রেমের কাহিনী, যাকে বলে কেচ্ছা সাহিত্য এবং নাগরী-লিপিবদ্ধ সাহিত্যই দীর্ঘকাল সরস ও আনন্দময় করে রেখেছে পল্লীজীবনকে।

এই লিপি সম্পর্কে জর্জ গিয়ারসন তাঁর লিঙ্গুইসটিক সারভে অব ইনডিয়া বইয়ে লিখেছেন—

Among the lowclass Muhammedans to the east of this district (Sythet) the use of Dev-nagari alphabet occurs. It is extremely common for Muhammedans to sign their names in this character and the only explanation they offer for its use is that it is so much easier to learn than Bengali.

শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'অরিজিন অ্যাণ্ড ডেভে-লাপমেণ্ট অব বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' বইতে প্রায় একই কথা লিখেছেন।

তাঁর বক্তব্য আর একটু স্পষ্ট---

In Sythet a kind of modified Deva-nagari called 'Sileti-nagari' has a restricted use among the local Mussalmans and this use of Nagari in distant East Bengal and among Mahomedans too is explained as being the result of the influence of early colonies of proselytising Moslems from Upper India who wrote their Vernaculars (Eastern and Western, Hindi dialects) in Devr-nagari—persianised Hindi (or Urdu) being not yet in the field—and tought it to the local converts a tradition in employing this alphabet was established and was continued down to our times. Recently this alphabet has been used in printing.

প্রবাদ আছে যে সিলেটী নাগরী শিখতে মাত্র আড়াই দিন লাগে। প্রবাদের মূলে রয়েছে, আগেই বলেছি, লিপির সরলতা। জটিল অক্ষর ও যুক্তবর্ণ বিসর্জন এই লিপিটির বৈশিষ্ট্য। ঢাকার বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত একটি বইয়ে সৈয়দ মুর্তাজা আলী সিলেটী নাগরী নিয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে ধ্বনি বিজ্ঞানের দিক থেকে লিপিটি উন্নততর। সিলেটী নাগরীতে মাত্র ৩২টি বর্ণ। তার মধ্যে উ, এ, ও, ক, খ, ঘ, চ, জ, ট, ত, থ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম এবং ল'—এই ১৮টি বর্ণের সঙ্গে প্রচলিত দেব-নাগরী বর্ণের সাদৃশ্য রয়েছে। ই, ঠ, ড, ঢ, দ, ড়—এই ৬টি বর্ণ বাংলা লিপি থেকে নেওয়া। আ, খ, ছ, ঝ, ধ, র, ল, হ—এই ৮টি বর্ণ সিলেটী নাগরীর নিজস্ব। তাছাড়া ফ, র, ভ—এই তিনটি বর্ণের সঙ্গে মিল আছে কায়থী লিপির।

সৈয়দ মুর্তাজা আলী বলেছেন, 'সিলেটী নাগরীর বর্ণমালা উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রেখে নির্ণীত হয়েছে। একটি উচ্চারণের

জন্য একটি বর্ণ—ধ্বনিবিজ্ঞানের এই নিয়ম অনুসারে নিম্নলিখিত বর্ণগুলি বর্জন করা হয়েছে—ঈ, ঐ, ঔ, ঋ, ৯, ঙ, ঞ, ণ, য, ষ, স, অ, ম্ম, স্ত, ব, ঃ, ঢ়। সিলেটী নাগরীর বর্ণ নির্বাচনে আরবী ফারসীর এভাব লক্ষ্য করা যায়। আরবী ফারসীর অনুকরণে সিলেটী নাগরীতে 'অ' বর্ণ নেই। আরবী 'ওয়াও' বর্ণের অনুকরণে সিলেটী নাগরীতে ব-বর্ণের নীচে বিন্দু দিয়ে ও-কে গ্রহণ করা হয়েছে। সিলেটী নাগরীর ক, খ, ফ-এর উচ্চারণ আরবী কাফ, খে, ফে-র মত। তা স্থানীয় উচ্চারণের সঙ্গে সমতা রক্ষা করেছে। সিলেটী নাগরীতে হ্রস্ব-ইকার বর্জিত হয়েছে। ই-কার অক্ষরের পূর্বে আসে এই বিষয় লক্ষ্য করে শুধু দীর্ঘ ঈ-কারই গ্রহণ করা হয়েছে। এ-কার এবং ঐ-কার বর্ণের পূর্বে বসে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য এ-কার ও ঐ-কারকে অক্ষরের মাত্রার উপর যথাক্রমে রূপে দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যদিও সিলেটী নাগরী যুক্তাক্ষর বর্জিত তবু মাঝে মাঝে এই লিপিতে ল্ল, ন্দ, স্ত—এই তিনটি যুক্তবর্ণের ব্যবহার দেখা যায়।

সিলেটী নাগরীতে গোড়ায় হাতের পুঁথিই ছিল। পরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সিলেটেরই মৌলবী আবদুল করিম ইউরোপ ঘুরে এসে সিলেটী নাগরী লিপিকে কিছু সংশোধন করে ছাপাখানা বসান। এই ছাপাখানা ইসলামিয়া প্রেস নামে পরিচিত। এখনও এই প্রেস থেকে কিছু কিছু বাংলা বই সিলেটী নাগরীতে ছাপা হয়। সিলেটের সারদা প্রেস থেকে নাগরী বই ছাপা হত। দেশ বিভাগের আগে কলকাতায়ও সিলেটী নাগরীর ছাপাখানা ছিল তালতলায় জেনারেল প্রিনটিং প্রেস। পরে এটিই ১৪১নং আপার সারকুলার রোডে উঠে যায়। শেয়ালদার হামিদী প্রেস থেকেও অনেক বই ছাপা হয়েছে।

এই লিপিতে প্রচারিত বাংলা সাহিত্য যেমন বিপুল, তেমনি বিচিত্র। এই সাহিত্য স্রষ্টাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় শীতালং শাহ,

শাহ নূর, সাদেক আলী, ইরফান আলী প্রমুখ। এঁরা যেমন একদিকে ইউসুফ জোলেখার প্রেম কাহিনী লিখেছেন সুললিত পয়ারে, তেমনি রাধাকৃষ্ণের বিষয় নিয়ে লিখেছেন বহু গান ও পাঁচালি। মূলত ইসলামের মাহাত্ম্যবর্ণন এবং মহম্মদের জীবনী গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করা এই লিপি সৃষ্টির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলেও কিছু প্রতিভাবান গ্রাম্য কবি ও সাধকদের হাতে পড়ে নাগরী লিপিতে লেখা কিছু কিছু বাংলা সাহিত্য শিল্প ও রসের বিচারে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা পেয়েছে। শুধু তাই নয়, জনপ্রিয় বহু হিন্দু পুরাণকাহিনীও সিলেটী নাগরীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। অন্যতম উদাহরণ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ভবানন্দের 'হরিবংশ'। এই নাগরীলিপিতেই গ্রাম্য কবি মুনিরউদ্দিন লিখেছেন, বিখ্যাত এবং বহুল প্রচলিত একটি গান—

"আমি মিছা কলঙ্কিনী সংসারে
সখিরে, পরান বন্ধু ছাড়িয়া গেল আমারে।
বৃন্দাবনে মধুপুর হয়গো রসের খেলা
তাহে হয় মনে জ্বালা হায় হায় হায়।
ওগো শুকনা কমল শুকাইয়া গেল
পায় না মধু ভোমরায়।
মধুপুর গেলা হরি না আসিল আর
হইল গোকুল অন্ধকার হায় হায় হায়। ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি আর একটি সিলেটী নাগরীলিপির বাংলা গান, যা আধুনিক কবির (বর্তমানে পূর্ববঙ্গের খ্যাতনামা সাহিত্যিক।) হাতে মার্জিত হয়ে বিখ্যাত একজন সংগীত শিল্পীর কণ্ঠে একদা সারা বাংলাদেশে গ্রামোফোন রেকর্ড মারফৎ ঘরে ঘরে জনপ্রিয় হয়েছিল। গানটি হল—

নিশীথে যাইও ফুলবনের ভ্রমরা
নিশীথে যাইও ফুল বনে।

নয় দরজা করি বন্ধ
লইও ফুলের গন্ধ
অন্তরে জপিও বন্ধুর নাম।
জ্বালাইয়া দিলরে বাতি
ফুটব ফুল নানা জাতি হে
কত রঙ্গে ধরব ফুলের কলি। ইত্যাদি।
(রে ভ্রমরা)

গানটির আদি রচয়িতা হবিগঞ্জের বামৈ পরগনার শেখ ভানু। আধুনিক লোকসংগীত হিসাবে তার বর্তমানরূপ কী হয়েছে সকলের জানা, পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই।